

চারুপাঠ

ষষ্ঠ শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে যষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

চারুপাঠ

যষ্ঠ শ্রেণী

সংকলন ও রচনা

মাহবুবুল হক

সম্পাদনা

আ. ন. ম. কামাল উদ্দীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ
সেলিম আহমেদ

চিত্রাঙ্কন
নাসির বিশ্বাস

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। তাই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এ ভাষায় ব্যবহারিক ও সৃজনশীল-উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন আবশ্যিক। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকে হতে হবে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

আমরা আশা করি, ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক ‘চারুপাঠ’-এ বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করে উক্ত চেতনায় উজ্জীবিত হতে পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কিছু বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সজ্জী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিদ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন : কিছু কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথা পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করা হয়নি।

বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য এসএসসি পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের আলোকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিগত বছরগুলোর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট নম্বরের শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্ন সৃষ্টিনির্ভর, যা শিক্ষার্থীরা মুখস্ত করে উত্তর দেয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ প্রশ্ন অনুধাবন স্তরের। প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা মূল্যায়নের প্রশ্ন খুবই কম। প্রচলিত এ পরীক্ষা পদ্ধতি মূলত শিক্ষার্থীর মুখস্ত করার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করে আসছে।

বস্তুত মুখস্ত, সাজেশন এবং নোট নির্ভর এ পরীক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীকক্ষের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক বুঝে লেখাপড়ার পরিবর্তে মুখস্ত করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। আর এ মুখস্ত করাও একটি কঠিন কাজ এবং এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের পাঠলব্ধ জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং উপাত্ত ও ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য যাচাই করার মতো ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রে থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সৃজনশীল প্রশ্নের অবতারণা।

প্রশ্নপত্রে পরিবর্তন

প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিন ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন। পরীক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তন করা হচ্ছে।

দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০% নম্বরের পরিবর্তে ৪০% বরাদ্দ থাকবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৩৫%, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০% এবং কৃষিশিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫% নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- ❑ বর্তমানে প্রচলিত শুধু সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঙ্গে বহুপদি সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- ❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের জ্ঞান বা মনে রাখার জন্য ৪০%, অনুধাবন বা বুঝে লেখার জন্য ৩০%, অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে প্রয়োগ করার জন্য ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতার তথা বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়নের জন্য ১০% প্রশ্ন থাকবে।
- ❑ শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করা হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন

প্রচলিত ৫০% নম্বরের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০% নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন। তবে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে এমন বিষয়ে ৪০% সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে মৌলিক অর্থাৎ যা পূর্বে কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন প্রক্রিয়া

- ❑ সৃজনশীল প্রশ্ন একটি দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক, সূচনা বক্তব্য (Stem বা Scenario) দিয়ে শুরু হবে।
- ❑ দৃশ্যকল্প/উদ্দীপকটি কোনো ঘটনা, গল্প, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ, সারণি, পেপার কাটিং, ছবি, উদ্ভৃতি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি হতে পারে।
- ❑ দৃশ্যকল্প হবে মৌলিক (Unique)। পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি এ দৃশ্যকল্পটি থাকবে না। তবে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্প রচনায় পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ভূতাত্মক ব্যবহার করা যাবে।
- ❑ দৃশ্যকল্পটি শিক্ষাক্রমের/পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে হতে হবে।
- ❑ দৃশ্যকল্পটি আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য হতে হবে।
- ❑ দৃশ্যকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে হবে।
- ❑ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের (ক-অংশ: জ্ঞান, খ-অংশ: অনুধাবন, গ-অংশ: প্রয়োগ ও ঘ-অংশ: উচ্চতর দক্ষতা) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
- ❑ গণিত, উচ্চতর গণিত এবং হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের তিন স্তরের (সহজ, মধ্যম এবং কঠিন) সমন্বয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন গঠিত হবে।
- ❑ দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে না, তবে উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা থাকবে।
- ❑ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মোট নম্বর হবে ১০।

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ও নম্বর বণ্টন

প্রশ্নের অংশ	চিন্তন দক্ষতার স্তর	নম্বর
ক	জ্ঞান দক্ষতা কোনো ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি স্মরণ করে বা মুখস্ত করে লিখতে পারার দক্ষতাকে জ্ঞান স্তরের দক্ষতা বোঝায়।	১
খ	অনুধাবন দক্ষতা কোনো অনুচ্ছেদ, কবিতা, প্রবন্ধ, লেখচিত্র ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা, কোনো কিছু একটা নিয়মে সাজানো, নিয়ম ও বিধি, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি ইত্যাদি পাঠ্যবই হতে হুবহু মুখস্ত না করে বুঝে নিজের ভাষায় উত্তর করার দক্ষতাকে অনুধাবন স্তরের দক্ষতা বলে।	২
গ	প্রয়োগ দক্ষতা এটি হল কোনো অর্জিত জ্ঞান এবং অনুধাবন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা। সূত্র, নিয়ম-বিধি ইত্যাদি প্রয়োগ করে নতুন পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতাকে প্রয়োগ স্তরের দক্ষতা বলে।	৩
ঘ	উচ্চতর দক্ষতা কোনো বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন করার দক্ষতা হল উচ্চতর দক্ষতা। আন্তঃসম্পর্ক, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয়, তুলনা করা, পার্থক্য করা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তৈরি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোনো সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা, মতামত প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি উচ্চতর স্তরের দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।	৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গদ্য		
১. আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ		১
২. সত্যতার পুরস্কার	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৭
৩. রক্তেলেখা মুক্তিযুদ্ধ	সাহিদা বেগম	১২
৪. নতুনদা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৭
৫. মাদার তেরেসা	সন্জীদা খাতুন	২৪
৬. সাগর জলের নানা প্রাণী	আবদুল্লাহ আল-মুতী	২৯
৭. নীলনদ আর পিরামিডের দেশ	সৈয়দ মুজতবা আলী	৩৫
৮. একসূত্রে	শওকত ওসমান	৪১
৯. জানা-অজানার সুন্দরবন	এ. এফ. এম. আবদুল জলীল	৪৮
১০. মহাকবি আলাওল	সিকান্দার আবু জাফর	৫৩
১১. পাখিদের নিয়ে	আলী ইমাম	৬২
১২. পায়ের নিচে এভারেস্ট	সেজান মাহমুদ	৬৭
১৩. মহান বিজ্ঞানী জগদীশ	বন্দে আলী মিয়া	৭২
১৪. জীবনের জন্য	মোহাম্মদ লুতফর রহমান	৭৮
১৫. গ্যাব্রোভোবাসীর রস-রসিকতা	মুহম্মদ এনামুল হক	৮৩
১৬. ইলেকট্রনিকস্-এর জাদুর ছোঁয়ায়	মাহবুবুল হক	৮৭
কবিতা		
১. জন্মেছি এই দেশে	সুফিয়া কামাল	৯৩
২. পরিচয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৬
৩. ওদের জন্য মমতা	কাজী নজরুল ইসলাম	৯৯
৪. বাংলা ভাষা	জসীমউদ্দীন	১০৩
৫. সুখ	কামিনী রায়	১০৬
৬. সকাল	হাবিবুর রহমান	১০৯
৭. প্রিয় স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান	১১২
৮. ঠিকানা	আতোয়ার রহমান	১১৬
৯. মৈত্রী	আবদুল কাদির	১২০
১০. নোলক	আল মাহমুদ	১২৩
১১. জীবনের হিসাব	সুকুমার রায়	১২৬
১২. মানুষ জাতি	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩০
১৩. হে কিশোর, শোনো	মহাদেব সাহা	১৩৪



আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ

সাগরে পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে শ্যামলে ছাওয়া বাংলাদেশ
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। আমরা প্রিয় বাংলাদেশকে যুদ্ধ করে
স্বাধীন করেছি। পাকিস্তানের শাসন আর শোষণের হাত থেকে
বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে। আমাদের স্বাধীন দেশ বিশ্বের
মানচিত্রে উজ্জ্বল স্থান করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস
জনপদের, কাব্য আর গানের। বহুকাল আগে এদেশে জনপদ
গড়ে উঠেছে। নানা প্রকৃতি, রং আর চেহারার মানুষ এখানে।
আকারেও বড়-ছোট মানুষ এদেশে। সবাই বাংলার মানুষ।

এই অঞ্চলের নানা অংশ একসময়ে নানা নামে পরিচিত ছিল।
গৌড়, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, সমতট, সুন্দর, হরিকেল আর বঙ্গা-
তেমনি এক-একটা নাম। বঙ্গ থেকেই বাংলা নামটি হয়েছে।

বাংলাদেশ আয়তনে বড় নয়। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এর আয়তন। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা বিপুল। ১৪৮,২৬,৪৫,১২০ জন মানুষ আছে এদেশে। আছে নানা ধর্মের মানুষ—মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। স্নেহ-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং নিজ নিজ ধর্মবোধ নিয়ে সকলে মিলেমিশে বাস করে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে বাঙালির সংখ্যাই বেশি। এখানে আরও আছে অনেক আদিবাসী-চাকমা, মারমা, টিপরা, মুরং, গারো, হাজং, মনিপুরি, খাসি, সাঁওতাল ও এমনি আরও অনেক। সবাই রয়েছে নিজ নিজ পোশাক-আশাক, ভাষা, খাবার-দাবার আর আচার-আচরণ। কিন্তু সব মিলিয়ে প্রত্যেকেই বাংলাদেশের মানুষ। এক রাষ্ট্র, এক শাসন, একই রকম অধিকার। তাই নিয়ে হৃদয় জুড়ে আমরা মাতৃভূমির সুখ ও শান্তি কামনা করি। একই রকম হাসি-কান্না, চিন্তা-ভাবনা আর উল্লাস-আনন্দ দিয়ে বাংলাদেশকে আপন করে নিই।

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। অনেক নদী আমাদের। বড় নদী আর ছোট নদীর মেলা যেন। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আর ব্রহ্মপুত্র বড় নদী। কর্ণফুলি, সুরমা, রূপসা, শীতলক্ষ্যা, কীর্তিনাশা, করতোয়া, মহানন্দা, মধুমতী, ইছামতী, ধানসিড়ি, চিত্রা, দুধকুমার, ফুলকুমারের মতো অনেক ছোট আর মাঝারি নদী আমাদের। সুন্দর তাদের নাম, যেন কবিতার মতো মনোহর। শস্য-শ্যামলে, পত্র-পুষ্পে ভরা এই দেশ। আমাদের অভাব আছে, অনটন আছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন লড়াই করি। তবু বলি: আমরা বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব।

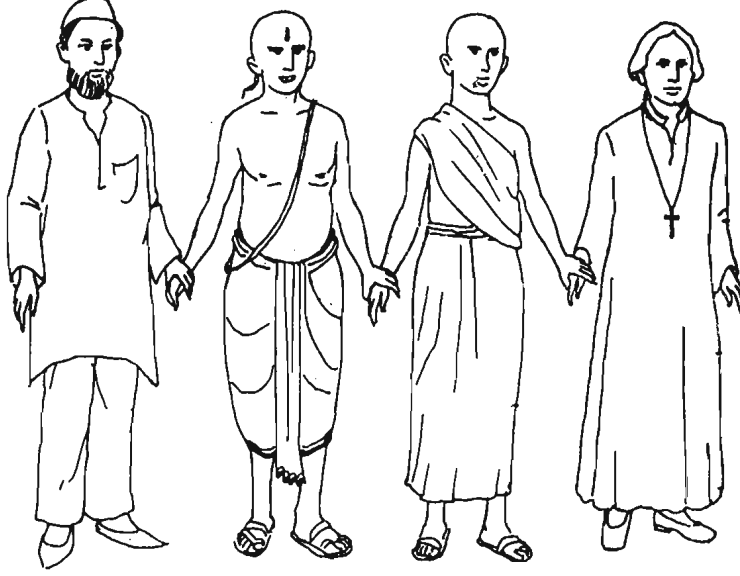
এদেশের মানুষ পরিশ্রমী। কঠোর শ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ জীবিকা অর্জন করে।



আমাদের আছে কামার, কুমার, আছে তাঁতি, জেলে। আর আছে কল-কারখানার শ্রমিক। মেয়েরা এদেশে তৈরী পোশাক শিল্পে সুচারুভাবে কাজ করছে। এখানকার পোশাক বিশ্বের দেশে দেশে প্রশংসা অর্জন করেছে। কৃষিপ্রধান এই দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছে চাষী। তাদের শ্রমে আমরা পাই নানারকম ফসল। কৃষকের গুণে সোনালি ধানের গন্ধে ভরে ওঠে বাংলার গৃহ আর প্রান্তর।

★ জনসংখ্যার তথ্যসূত্র : KEY INDICATORS ON SAMPLE VITAL REGISTRATION SYSTEM 2007

উৎসবের দেশ বাংলাদেশ। আছে ঈদ, আছে পুজো। আর আছে বৌদ্ধ পূর্ণিমা ও বড়দিনের উৎসব। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ মহানন্দে তাদের উৎসব পালন করে। আরও আছে নতুন ধানের নবান্ন-উৎসব। আছে শুভ নববর্ষ, একুশের বইমেলা। আছে বিজয় দিবসের উৎসব, আছে রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী। উৎসবের আনন্দে, নৃত্যগানে, কবিতা ও কথকতায় ভরে থাকে বাংলাদেশ। গ্রামে গ্রামে রাতভর যাত্রা-পালাগান, আর কবি-গানের আসর বসে। স্কুলে কলেজে শহরে বন্দরে হয় থিয়েটার।



বাংলার মানুষের পোশাক খুব সাদাসিধে এবং উপযোগী। লুঙ্গি, পাঞ্জামা, পাঞ্জাবি, প্যান্ট, শার্ট পুরুষদের পোশাক। শাড়ি, সালোয়ার, কামিজ, থামি মেয়েদের পোশাক। তাছাড়া আছে শেরওয়ানি, টুপি, ধুতি। নিজ নিজ ধর্ম ও সামাজিক রীতি অনুসারে সকলেরই পোশাক আছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলাভাষার মাধ্যমে অফিস-আদালত ও শিক্ষার কাজ চলে। বাংলার মাতৃভাষার অধিকার পাকিস্তানিরা স্বীকার করতেই চায়নি। জোর করে আমাদের ওপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাংলার মানুষ তাই ভাষার জন্য সংগ্রাম করল। মাতৃভাষার অধিকারের জন্য জীবন দিল। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলার গৌরবের দিন। বিশ্ববাসী আজ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

ষড়ঋতুর দেশ বাংলা। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তের বাংলাদেশ। শরৎ আর হেমন্তও আছে। গ্রীষ্মের সন্তাপ, বর্ষার সজলতা, শরতের নীল, হেমন্তের সৌরভ আর শীতবসন্তের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ। বাংলার উত্তরে পাহাড় আর দক্ষিণে সমুদ্র। উত্তর-পশ্চিমে শক্ত মাটি, দক্ষিণ-পূর্বে নরম মাটি। বাংলার সুন্দরবন জগৎখ্যাত। এখানে হরিণ আর পাখির মেলা আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার এই অরণ্যের রাজা। বাংলার বিল-হাওরে আছে শাপলা-শালুকের শোভা। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মধ্যে আছে অফুরান মাছ। আর আছে প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের মাটির গভীরে আছে গ্যাসের বিপুল মজুত। এই গ্যাস থেকে উৎপাদন করা হচ্ছে বিদ্যুৎ ও সার। জ্বালানি হিসেবে শহরের অনেক বাড়িতে ব্যবহার করা হয় গ্যাস।

আমাদের বাংলাদেশে নানারকম মিষ্ট আর সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। একেক ঋতুতে একেক রকম ফল। গ্রীষ্মকালের আরেক নাম মধুমাস। এ সময় আম, জাম, কাঁঠালের মেলা লেগে যায়। আর আমও অনেক রকম-গোপালভোগ, খিরসাপতি, ল্যাংড়া, ফজলি। বাংলার ফজলি খুব বিখ্যাত। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এছাড়াও আছে তরমুজ, তাল, নারকেল। সবচেয়ে বেশি হয় কলা। বছরের সবসময় কলা পাওয়া যায়।

চারুপাঠ

বাংলাদেশে নানা ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত। ফুটবল সবচেয়ে প্রিয় খেলা। তবে কাবাডি, হাডুডু, গোল্লাছুট, কানামাছি খেলাও গ্রামবাংলায় খুব জনপ্রিয়। এখন আবার জমে উঠেছে ক্রিকেট খেলা। বাংলাদেশ ক্রমেই বিশ্বক্রিকেট অঙ্গানে স্থান করে নিচ্ছে। এমন দিন আসবে যখন বাংলাদেশের ক্রিকেট বিশ্বের সেরা দলগুলোর কাতারে উঠবে।

ভাত-মাছের মানুষ আর সাগর, প্রান্তর, পাহাড়ের প্রকৃতি মিলে অনন্য এক জাতি ও দেশ। এমন দেশের জন্য আমাদের যত কর্ম ও সাধনা। এমন দেশের জন্য আমাদের যত কাব্য আর গানের আয়োজন। বড় ভালোবাসি বাংলাদেশকে।

শব্দার্থ

সুচারুভাবে	-	খুব সুন্দরভাবে, অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে।	থামি	-	উপজাতীয় নারীর পোশাক।
উল্লাস	-	অত্যন্ত উৎফুল্ল, চরম আনন্দের প্রকাশ।	কথকতা	-	পুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যান।
জনপদ	-	লোকালয়, লোকবসতি অঞ্চল।	আদিবাসী	-	আদিম অধিবাসী।
মনোহর	-	রমণীয়, খুব সুন্দর, পছন্দসই।	অনন্য	-	অসাধারণ।
সাধনা	-	লক্ষ্য অর্জনের নিরন্তর প্রচেষ্টা।	সস্তাপ	-	উত্তাপ।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও জীবনের রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে এই লেখাটিতে।

নিসর্গ-শোভিত প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। রক্তাক্ত যুদ্ধ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এ দেশের আছে হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। অধিবাসীদের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে আছে ভিন্নতা। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ বাঙালি, আরও আছে বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসী। কিন্তু সবাই বাংলাদেশের মানুষ। অতীতে এ অঞ্চলের নানা অংশ পরিচিত ছিল নানা নামে। সেগুলোর মধ্যে ‘বঙ্গ’ নামটি থেকে ‘বাংলা’ নামের উৎপত্তি।

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট কিন্তু জনসংখ্যা বিপুল। এদেশে বাস করে নানা ধর্মের মানুষ। তাদের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্প্রীতি।

নদীমাতৃক এ দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদী। সেসব নদীর নামে রয়েছে কাব্যিক মাধুর্য।

এ দেশের মানুষ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচে, বাঁচার জন্যে করে প্রচুর পরিশ্রম। শ্রমজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হল কৃষক। এ ছাড়াও রয়েছে কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, কলকারখানার শ্রমিক। মেয়েদের একটা বড় অংশ কাজ করে পোশাক তৈরির কারখানায়।

বাংলাদেশ উৎসবের দেশ। ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় উৎসব যেমন আছে তেমনি আছে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন, অনুষ্ঠান ও থিয়েটার।

বাংলার মানুষের পোশাকেও রয়েছে বৈচিত্র্য। আছে ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এ ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। এ দিনটি এখন পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ঋতু-পরিক্রমা এ দেশের প্রকৃতিকে সাজায় রূপের বৈচিত্র্যে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতেও বৈচিত্র্য কম নয়।

এইসব বৈচিত্র্য নিয়েই বাংলাদেশ এক অনন্য দেশ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ কীভাবে জীবিকা অর্জন করে?
ক. তাঁতশিল্পের মাধ্যমে
খ. কঠোর শ্রমের বিনিময়ে
গ. মৃৎশিল্পের মাধ্যমে
ঘ. মৎস্যচাষের মাধ্যমে।
- বর্তমানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের একসময়কার কিছু নাম নিচে দেওয়া হল—
i. গৌড়, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়
ii. বঙ্গ, বিহার, হরিকেল, সুন্দা
iii. সমতট, সুন্দা, হরিকেল, বঙ্গ

কোন নামের গুচ্ছে নিম্নে বর্তমান বাংলাদেশ গঠিত ?

- | | |
|-------|-----------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii | ঘ. iii |

উদ্ভূত্যাংগটি পড়ে নিচের ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নটির উত্তর দাও।

এখানে আছে ঈদ, আছে পুজো। আর আছে বৌদ্ধ পূর্ণিমা ও বড়দিনের উৎসব। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ মহানন্দে তাদের উৎসব পালন করে। আরও আছে নবান্ন-উৎসব। আছে শুভ নববর্ষ, একুশের বইমেলা। আছে বিজয় দিবসের উৎসব। আছে রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী।

- উদ্ভূত্যাংগে প্রকাশ পেয়েছে—
ক. জাতীয় ছুটির দিনের কথা
খ. জাতীয় উৎসবের কথা
গ. অসাম্প্রদায়িক উৎসবের কথা
ঘ. শহুরে উৎসবের কথা
- নবান্ন উৎসব কী?
ক. নতুন বছর আগমনের উৎসব
খ. নতুন ফসল আগমনের উৎসব
গ. নতুন শিশুর জন্মের উৎসব
ঘ. নতুন বধু বরণের উৎসব

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলার মাতৃভাষার অধিকার পাকিস্তানিরা স্বীকার করতেই চায়নি। জোর করে আমাদের ওপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাংলার মানুষ তাই ভাষার জন্য সংগ্রাম করল। মাতৃভাষার অধিকারের জন্য জীবন দিল। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলার গৌরবের দিন। বিশ্ববাসী আজ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছে।

- উর্দুভাষা কোন দেশের ভাষা?
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের ওপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল কেন?
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে তোমার নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লেখ।
- মাতৃভাষার জন্য জীবনদানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশে নানা ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত। ফুটবল সবচেয়ে প্রিয় খেলা। তবে কাবাডি, হা ডু ডু, গোল্লাছুট, কানামাছি খেলাও গ্রামবাংলায় খুব জনপ্রিয়। এখন আবার জমে উঠেছে ক্রিকেট খেলা। বাংলাদেশ ক্রমেই বিশ্বক্রিকেট অঙ্গানে স্থান করে নিচ্ছে। এমন দিন আসবে যখন বাংলাদেশের ক্রিকেট বিশ্বের সেরা দলগুলোর কাতারে উঠবে।

- ক. বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কোনটি?
- খ. গ্রামবাংলার প্রচলিত খেলাগুলো নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন খেলাটি তোমার প্রিয় এবং কেন?
- ঘ. জাতীয় জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

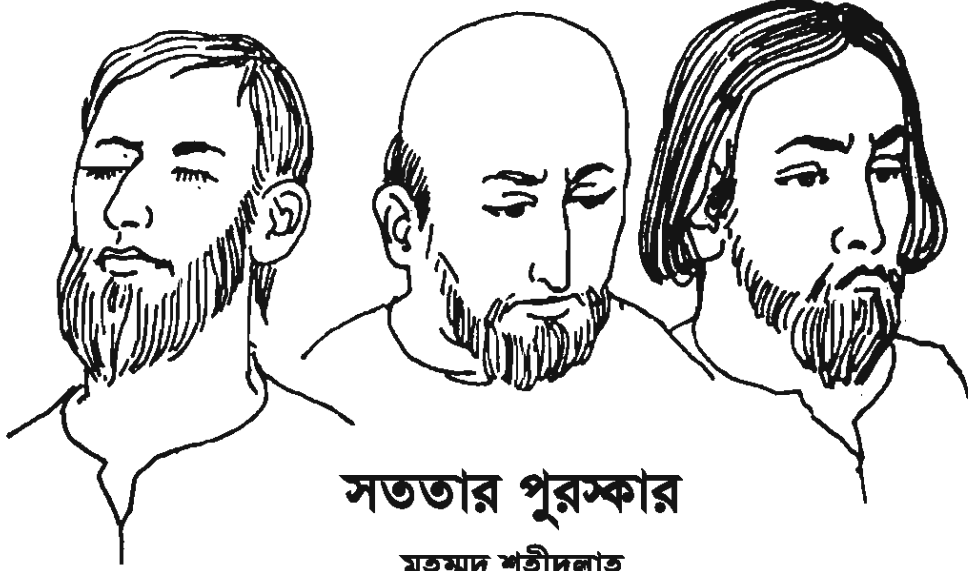
ষড়ঋতুর দেশ বাংলা। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তের বাংলাদেশ। শরৎ আর হেমন্তও আছে। গ্রীষ্মের সস্তাপ, বর্ষার সজলতা, শরতের নীল, হেমন্তের সৌরভ আর শীত-বসন্তের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ।

- ক. কোন কোন মাসে গ্রীষ্মকাল?
- খ. গ্রীষ্মের সস্তাপ বলতে কী বোঝায়?
- গ. বামপাশের ঋতুগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশগুলো বাছাই করে মিলাও।

বর্ষা
শীত
বসন্ত

(কাঁঠাল পাকে)
নতুন পাতা
সতেজ প্রকৃতি
নবান্নের উৎসব
মৃদু রোদ
(সুন্দর আকাশ)

- ঘ. ‘হেমন্তের সৌরভ আর শীত-বসন্তের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ’ উদ্ঘৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।



সেকালে ইহুদি বংশে তিনটি লোক ছিল—একজনের সর্বাঙ্গে ধবল, একজনের মাথায় টাক, আরেকজনের দুই চোখ অন্ধ। আল্লাহ তাহাদের পরীক্ষার জন্য তাহাদের কাছে এক ফেরেশতা পাঠাইলেন। ফেরেশতা হইলেন আল্লাহর দূত। তাহারা নূরের তৈয়ারী। এমনি কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। আল্লাহর হুকুমে তাঁহারা সকল কাজ করিয়া থাকেন।

ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরিয়া প্রথমে ধবলরোগীর নিকটে আসিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাস?

ধবলরোগী বলিল, আহা! আমার গায়ের রং যদি ভালো হয়। সকলে যে আমাকে বড় ঘৃণা করে।

স্বর্গীয় দূত তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার রোগ সারিয়া গেল। তাহার গায়ের চামড়া ভালো হইল।

তারপর আল্লাহর দূত পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমি কী চাও?

সে বলিল, আমি উট চাই।

দূত তাহাকে একটি গাভিন উট দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

তারপর সেই ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গিয়া বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাস?

সে বলিল, আহা! আমার এই রোগ যদি সারিয়া যায়! যদি আমার মাথায় চুল উঠে!

আল্লাহর দূত তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার টাক সারিয়া গেল। তাহার মাথায় চুল গজাইল। দূত পুনরায় বলিলেন, এখন তুমি কী চাও?

সে বলিল, গাই।

তিনি তাহাকে একটি গাভিন গাই দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

চারুপাঠ

তারপর স্বর্গীয় দূত অশ্বের কাছে গেলেন। গিয়া বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাস ?

সে বলিল, আল্লাহ্ আমার চোখ ভালো করিয়া দিন। আমি যেন লোকের মুখ দেখিতে পাই।

স্বর্গীয় দূত তাহার চোখে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার চোখ ভালো হইয়া গেল।

তারপর তিনি তাহাকে বলিলেন, এখন তুমি কী চাও ?

সে বলিল, আমি ছাগল চাই।

স্বর্গীয় দূত তাহাকে একটি গাভিন ছাগল দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

তারপর উটের বাচ্চা হইল, গাইয়ের বাছুর হইল, ছাগলের ছানা হইল। এইরকম করিয়া উটে, গাইয়ে, ছাগলে তাহাদের মাঠ বোঝাই হইয়া গেল।

কিছুদিন পর আবার সেই ফেরেশতা পূর্বের মতো মানুষের রূপ ধরিয়া, সেই যে আগের ধবলরোগী ছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে গিয়া তিনি বলিলেন, আমি এক বিদেশী। বিদেশে আসিয়া আমার সব পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহ্ দয়া ছাড়া আমার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই। যিনি তোমাকে সুন্দর গায়ের রং দিয়াছেন, সুন্দর চামড়া দিয়াছেন, আর এত ধনদৌলত দিয়াছেন, তাঁহার দোহাই দিয়া তোমার কাছে একটি উট চাহিতেছি।

সে বলিল, উটের অনেক দাম, কী করিয়া দিই ?

স্বর্গীয় দূত বলিলেন, ওহে! আমি যেন তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। তুমি না ধবলরোগী ছিলে, আর সকলে তোমাকে ঘৃণা করিত ? তুমি না গরিব ছিলে, পরে আল্লাহ্ তোমাকে ধনদৌলত দিয়াছেন ?

সে বলিল, না, তা কেন ? এসব তো আমার বরাবরই আছে।

স্বর্গীয় দূত বলিলেন, আচ্ছা ! যদি তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক, তবে তুমি যেমন ছিলে আল্লাহ্ আবার তোমাকে তাহাই করিবেন।

তারপর দূত পূর্বে যে টাকওয়ালা ছিল, তাহার কাছে গেলেন। সেখানে গিয়া আগের মতো একটি গাই চাহিলেন। সেও ধবলরোগীর মতো তাহাকে কিছুই দিল না। তখন দূত বলিলেন, আচ্ছা, যদি তুমি মিথ্যাকথা বলিয়া থাকো তবে যেমন ছিলে আল্লাহ্ তোমাকে আবার তেমনি করিবেন।

তারপর স্বর্গীয় দূত পূর্বে যে অন্ধ ছিল, তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, আমি এক বিদেশী। বিদেশে আমার সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহ্ দয়া ছাড়া আমার দেশে পৌঁছিবার আর কোনো উপায় নাই। যিনি তোমার চক্ষু ভালো করিয়া দিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহ্ দোহাই দিয়া একটি ছাগল চাহিতেছি; যেন আমি সেই ছাগল-বেচা টাকা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

তখন সে বলিল, হ্যাঁ ঠিক তো। আমি অন্ধ ছিলাম, পরে আল্লাহ্ আবার আমাকে দেখিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি গরিব ছিলাম, তিনি আমাকে আমির করিয়াছেন। তুমি যাহা চাও লও। আল্লাহ্ কসম, আল্লাহ্ উদ্দেশ্যে যে জিনিস লইতে তোমার মন চায়, তাহা যদি তুমি না লও, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই ভালো লোক বলিব না।

ফেরেশতা তখন বলিলেন, বাস্। তোমার জিনিস তোমারই থাক। তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। আল্লাহ্ তোমার উপর খুশি হইয়াছেন, আর তাহাদের উপর বেজার হইয়াছেন।

শব্দার্থ

ধবল	-	সাদা (এখানে কুষ্ঠরোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।	নূর	-	জ্যোতি, আলো।
ইহুদি	-	হজরত মুসা (আ) প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী।	পুঁজি	-	সম্বল, মূলধন।
আমির	-	প্রধান, ধনী, ধনবান, সম্ভ্রান্ত লোক।	দোহাই	-	শপথ, কসম।
সর্বাঙ্গে	-	(সর্ব + অঙ্গে) সারা শরীর, সমস্ত দেহ।	সম্বল	-	পাথেয়, পুঁজি।
কসম	-	শপথ, দোহাই (আল্লাহর কসম)।	বেজার	-	অখুশি, অসন্তুষ্ট।
স্বর্গীয় দূত	-	আল্লাহর বার্তাবাহক, সংবাদবাহক।			

পাঠ-পরিচিতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই গল্পে হাদিসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গল্পের মূল বাণী হচ্ছে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন এবং সৎলোককে যথাযথ পুরস্কার দেন।

ইহুদি বংশের তিন জন লোককে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান। এদের এক জন কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন টাকওয়ালা এবং তৃতীয় জন অন্ধ।

ফেরেশতার অনুগ্রহে এই তিন জনেরই শারীরিক ত্রুটি দূর হল। তিন জনই সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেহারা পেল। শুধু তাই নয়, ফেরেশতার কৃপায় প্রথম জন একটি উট থেকে বহু উটের, দ্বিতীয় জন একটি গাভী থেকে বহু গাভীর এবং তৃতীয় জন একটি ছাগল থেকে বহু ছাগলের মালিক হয়ে গেল।

কিছুদিন পর এদের পরীক্ষা করার জন্য ফেরেশতা গরিব বিদেশির ছদ্মবেশে এদের কাছে হাজির হলেন। তিনি এক এক জনের কাছে গিয়ে তাদের আগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে কিছু সাহায্য করতে বললেন। প্রথম দুজন তাদের আগের অবস্থার কথা অস্বীকার করে ছদ্মবেশী ফেরেশতাকে খালিহাতে বিদায় দিল। কিন্তু তৃতীয় জন নির্দিষ্টায় তাঁকে তাঁর ইচ্ছেমতো সবকিছু দিতে রাজি হল। আল্লাহ তার ওপর খুশি হলেন। এবং তার সম্পদ তার রয়ে গেল। কিন্তু প্রথম দুজনের ওপর আল্লাহ নাখোশ হলেন এবং তাদের অবস্থা আগের মতো হয়ে গেল। অকৃতজ্ঞতার উপযুক্ত ফল পেল।

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে। তিনি বহুভাষাবিদ ও পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত বি.এ. অনার্স ও ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাস করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ছাত্র। পরে তিনি প্যারিস সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ব্যাকরণ রচনাতেও তাঁর অবদান স্মরণীয়।

কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। ছোটদের জন্য তাঁর লেখা রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—‘শেষ নবীর সম্প্রদান’ ও ‘গল্প মঞ্জুরী’। তাঁর সম্পাদনায় শিশু-পত্রিকা ‘আঙুর’ প্রকাশিত হয়। ‘বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধান’ সম্পাদনা তাঁর অসামান্য কীর্তি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১. ফেরেসতা কেন ইহুদিদের কাছে এসেছিলেন?
 - ক. সাহায্য নেওয়ার জন্য
 - খ. পরীক্ষা করার জন্য
 - গ. শিক্ষা দেয়ার জন্য
 - ঘ. মূল্যায়নের জন্য
২. বিষয়বস্তু ও গাঠনিক দিক থেকে সততার পুরস্কার কোন ধরনের রচনা ?
 - i. গল্প
 - ii. প্রবন্ধ
 - iii. উপদেশমূলক

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

ছদ্মবেশী ফেরেসতা কিছুদিন পর ঐ তিন ব্যক্তির নিকট হাজির হয়ে তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি তাদের পূর্বের অবস্থার কথা অস্বীকার করলেন এবং ছদ্মবেশী ফেরেসতাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি নির্দিষ্টায় ফেরেসতাকে তার সবকিছু দিতে রাজি হলেন।

৩. ফেরেস্টা ছদ্মবেশে ঐ তিন ব্যক্তির নিকট হাজির হলেন— তাদের

ক. সাহায্য করার জন্য	খ. কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য
গ. ঈমান পরীক্ষা করার জন্য	ঘ. পুরস্কৃত করার জন্য

৪. ফেরেস্টার প্রতি প্রথম দুই ব্যক্তির আচরণে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহর প্রতি তাদের

- কৃতজ্ঞতা
- কৃতঘ্নতা
- আনুগত্য

[illegible]

৫. তৃতীয় ব্যক্তি ফেরেসতাকে সবকিছু দিতে রাজি হলেন, কারণ তিনি

- প্রকৃত ঈমানদার
- আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ
- পার্থিব সন্মানের প্রতি দর্বল

ক. i
খ. i ও ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

তখন সে বলিল, হ্যাঁ ঠিক তো। আমি অন্ধ ছিলাম। পরে আল্লাহ আবার আমাকে দেখিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি গরিব ছিলাম, তিনি আমাকে আমির করিয়াছেন। তুমি যাহা চাও লও। আল্লাহর কসম, আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে জিনিস লইতে তোমার মন চায়, তাহা যদি তুমি না লও, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই ভালো লোক বলিব না। ফেরেশতা তখন বলিলেন, বাস! তোমার জিনিস তোমারই থাক। তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। আল্লাহ তোমার উপর খুশি হইয়াছেন, আর তাহাদের উপর বেজার হইয়াছেন।

- ক. উদ্ভূতাংশটির লেখক কে?
- খ. ‘তোমার জিনিস তোমারই থাক’ – ফেরেশতা কেন একথা বলেছিলেন?
- গ. উদ্ভূতাংশের অন্ধলোকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গল্পে উল্লিখিত ধবলরোগীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নির্ণয় কর।
- ঘ. সততার পুরস্কার গল্পের আলোকে মানুষের ঈমান পরীক্ষার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

একসময় তিনজন ইহুদি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় ভুগছিল। আল্লাহ তাঁর ফেরেসতা পাঠিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করে দিলেন। কিছুদিন পর আল্লাহ তাদের পরীক্ষার নেওয়ার জন্য আবার ফেরেসতা পাঠালেন। দুজন ইহুদি তাদের অতীতের কথা ভুলে গেল। এমনকি বর্তমান অবস্থা তাদেরই কৃতিত্ব বলে দাবি করল। একজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।

- ক. যারা অতীত উপকারের কথা স্বীকার করে তাদের আমরা কী বলি?
- খ. আল্লাহ প্রথম দুই ইহুদিকে শাস্তি দিলেন কেন?
- গ. কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ ইহুদিদের পার্থক্য বর্ণনা কর।
- ঘ. মানুষের ঈমান পরীক্ষাকরণের যে প্রক্রিয়া গল্পে বর্ণিত হয়েছে তার উপর তোমার যৌক্তিক অভিমত উপস্থাপন কর।

একজন মুক্তিযোদ্ধার চিঠি



১৬. ৭. ১৯৭১

মা,

মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প থেকে লিখছি। এখন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর কাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত দিগন্ত মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাই মনটা ভালো না। আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বাকাশে যে লাল সূর্য ওঠে, তার কাঁচা আলো খুব উজ্জ্বল হয়, তাই না? এই মুহূর্তে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ষা এলে তুমি বাইরে যেতে দিতে না, একদিন তোমার অজান্তে বাইরে আসতেই পিছলে পড়ে পায়ের চোট লাগে। তখন তুমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলে। ওষুধ দিয়ে ভর্তি হয়েছিল টেবিলটা, আমার বেশ মনে আছে। তখন থেকে একা বাইরে যেতে সাহস পেতাম না, ভয় লাগত। বাইরে গেলেই পড়ে যাব। কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে, রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাৎকারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে তবুও ভয় পাই না। শত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে শিরায়-উপশিরায় রক্তের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মা, সত্যিই তোমাকে বোঝাতে পারব না। ছোটবেলার কথা মনে পড়লে কেমন যেন লাগে। কিন্তু আমার একি আশ্চর্য পরিবর্তন, কারণ আমি আমার স্বদেশ, আমার বাংলাকে ভালোবাসি।

মা, কৈশোরে একদিন আব্বা আমাকে সৈয়দপুরে নিয়ে গিয়েছিল, স্পেশাল ট্রেন দেখাতে। সেখান থেকে আমি হারিয়ে যাই। তখন একলা একলা অনেকক্ষণ ঘুরেছিলাম। ধীরে ধীরে সম্প্রদায় ঘনঘটা নেমে আসছিল, আমার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। মনে হয়েছিল আমি হারিয়ে গেছি। তখন মনে হয়েছিল আর কোনোদিনই হয়তো তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব না। তখন কাঁদতে কাঁদতে স্টেশনের দিকে আসতে শুরু করেছিলাম। রাস্তায় হাজারি বেলপুকুরের হাই-ই আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। দেখি, সেখানে কিছুক্ষণ পরে আব্বা গেলেন। পরের দিন এসে সমস্ত কথা শুনতে না শুনতেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তুমি কাঁদছিলে। অথচ সেদিন তুমি তো কাঁদলে না মা! আমি রণাঙ্গনে চলে এলাম। গুলি, শেল, মর্টার নিয়ে আমার জীবন। ইয়াহিয়ার জঘন্যতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দুর্জয় শপথ নিলাম। এখন বাৎকারে বাৎকারে বিনীত রজনী কাটাতে হয়। কখনো বা রাতের অন্ধকারে শত্রুর ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই। এ যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ। মা, আমাদের জয় হবেই হবে।

মাগো, সেদিনের সম্প্রদায়টাকে আমার বেশ মনে পড়ছে। আজকের মতো মেঘলা মেঘলা আকাশ সেদিন ছিল না। সমস্ত আকাশটা তারায় ভর্তি ছিল। তুমি রান্নাঘরে বসে তরকারি কুটছিলে।

আমি তোমাকে বললাম-মা, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি মুখের দিকে তাকালে। আমি বলেছিলাম, ‘মা, আমি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাচ্ছি।’ উনুনের আলোতে তোমার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তোমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তুমি দাঁড়িয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তাকালে। আমার ঘরের পেছনে বেলগাছটার কিছু পাতা বাতাসে দোল খেয়ে আবার স্থির হয়ে গেল। মা, সেদিন সম্প্রদায়েই তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলে। মা, মনে হচ্ছে কত যুগ পেরিয়ে গেছে, এক একটি দিন ইতিহাসের পাতার মতো রয়ে গেছে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা অন্যায়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু মা, দিনান্তের ক্লান্তিতে নিত্যকার মতো সেই সম্প্রদায়টা আবার আসবে তো?

ইতি

তোমার স্নেহের

ববিন।

পাঠ পরিচিতি

একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের মহান গৌরবগাথা। তখন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দাম সাহস ও অসীম বীরত্ব আমাদের এনে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। জন্ম হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের।

এ চিঠির লেখক একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর নাম মোহাম্মদ আবদুর রউফ ববিন। তিনি ৬ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি এ চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর মা মোছাম্মৎ রফিয়া খাতুনকে। চিঠি থেকে ঐ সময়ে তাঁর মনের অবস্থা জানা যায়। চিঠিতে রয়েছে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার স্মৃতি। তাতে আরো আছে মুক্ত স্বদেশে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে।

এ চিঠিটি ‘প্রথম’ প্রকাশিত ‘একান্তরের চিঠি’ নামের গ্রন্থ থেকে সংকলিত।



দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি। অনেক বিলম্বে ইন্দের নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। তাঁদের আলোতে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু অর্থাৎ ভয়ংকর বাবু। সিঙ্কের মোজা, চক্চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোট মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি, পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত ‘যাচ্ছেতাই’ বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দের কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

‘তোর নাম কি রে ?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, ‘শ্রীকান্ত’।

তিনি দাঁত খিচাইয়া বলিলেন, ‘আবার শ্রী-কান্ত! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ্জ।’

ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ‘শ্রীকান্ত তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজছি।’

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। তামাক সাজিয়া ঝুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, ‘তুই থাকিস কোথা রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কিরে? র্যাপার? আহা! র্যাপারের কী শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। পেতে দে দেখি, বসি!’

‘আমি দিছি নতুনদা। আমার শীত করছে না—এই নাও’ বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গজা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধঘণ্টার মধ্যে ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতাস পড়িয়া গেল। ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, ‘নতুনদা, এ যে ভারি মুশকিল হল, হাওয়া পড়ে গেল। আর তো পাল চলবে না।’ নতুনদা জবাব দিলেন, ‘এই ছোঁড়াটাকে দে—না দাঁড় টানুক।’

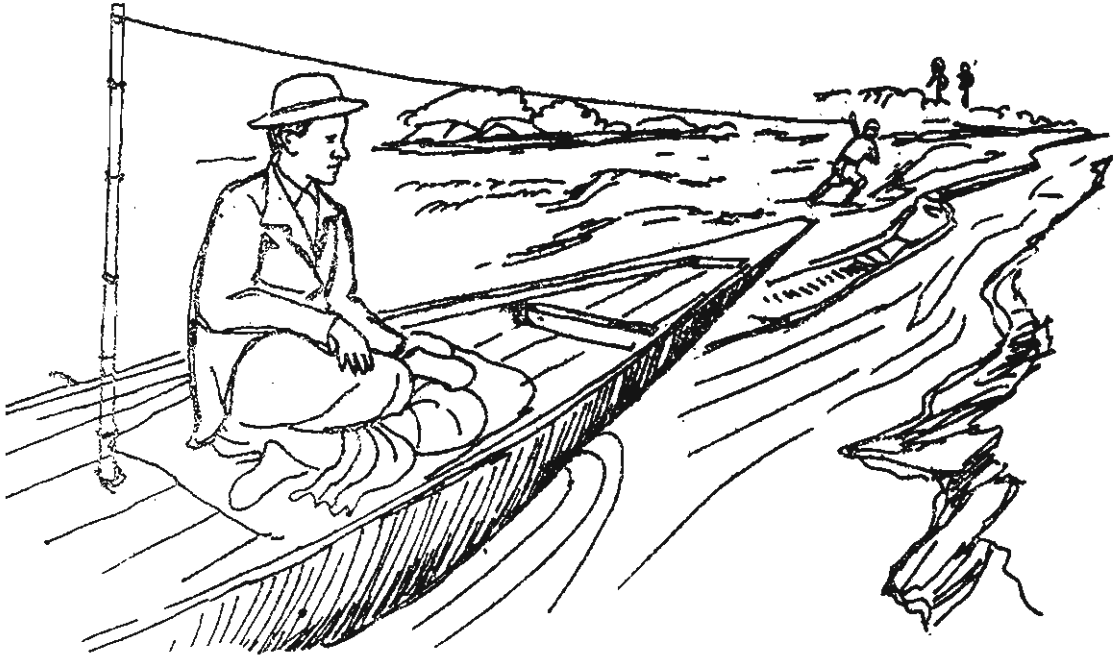
কলিকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ শ্লান হাসিয়া কহিল, ‘দাঁড়! কারুর সাধ্য নেই নতুনদা, এই স্রোত ঠেলে উজ্জান বেয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।’

প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা একমুহূর্তে একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন—‘তবে আনলি কেন হতভাগা? যেমন করে হোক, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে। তারা বিশেষ করে ধরেছে।’

ইন্দ্রের অবস্থা সংকট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ‘ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?’ বাবু অমনি দাঁতমুখ ভেঙাইয়া বলিলেন, ‘তবে যাও না, টানো গে নাহে! জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন?’

তারপরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনোবা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নিচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মতো ঠান্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তাহারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাহাকে হাল ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলিয়া এই ঠান্ডায় নিউমোনিয়া করিতে পারিবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, না—খুলে—

হ্যাঁ, আমি দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি! নে—যা করছিস কর।’



আরও বিপদ গজার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্বেক হইল; বলিলেন, ‘হ্যারে ইন্দ্র, এদিকে খোঁটামোঁটাদের বসতি—টসতি নেই? মুড়ি—টুড়ি পাওয়া যায় না?’

ইন্দ্র কহিল, ‘সামনেই একটা বেশ বড় বসতি নতুনদা, সব জিনিস পাওয়া যায়।’

‘তবে লাগা—ওরে ছোঁড়া! টান্ না একটু জোরে, ভাত খাসনে?’

অনতিকাল পরে আমরা একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সংকীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, ‘হাত—পা একটু খেলানো চাই। নামা দরকার।’ অতএব ইন্দ্র তাহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল।

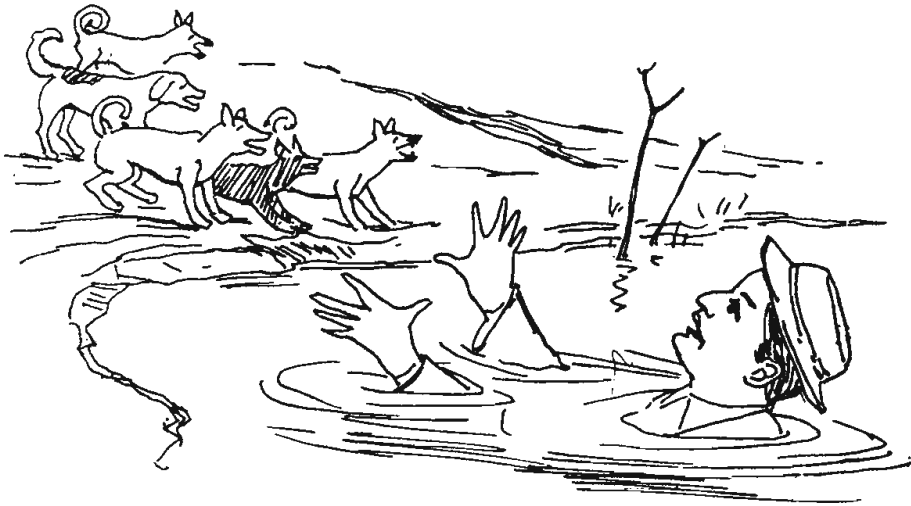
আমরা দুজনে তাহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পাট সমস্তই ইন্দের জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানি শীতের ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া এবং যতপ্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই যে শূন্য! ডিঙি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে, কিন্তু ইনি কোথায় গেলেন! দুজনে প্রাণপণে চিৎকার করিলাম, ‘নতুনদা!’ কিন্তু কোথায় কে?

এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের উৎপাতের কথাও শোনা যাইত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল—‘বাঘে নিলে না তো—রে?’ সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল কিছুদূরে বাগির উপর কী একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চকচক করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাহারই সেই বহুমূল্য পাম্প-সুর একপাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বাগির উপরেই একেবারে শূইয়া পড়িয়া বলিল—‘শ্রীকান্তরে, আমার মাসিমাও এসেছেন যে, আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না।’

তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদির দোকানে দাঁড়াইয়া দোকানিকে জাগাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন এইদিকের কুকুরগুলিও যে সমবেত আর্তচিৎকারে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই আমাদের গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মতো বুঝিতে পারিলাম। এখনও দূরে তাহাদের ডাক শোনা যাইতেছে। সুতরাং আর সংশয় মাত্র রহিল না যে, নেকড়েগুলি তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজ করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া কুকুরগুলি এখন চোঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘আমি যাব।’ আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম, ‘পাগল হয়েছে ভাই।’ ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ-হাতে লইয়া সে কহিল, ‘তুই থাক শ্রীকান্ত, আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস—আমি চললাম।’

আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনোমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। কিন্তু আমারও তো যাওয়া চাই। আমিও নিতান্ত ভীৰু ছিলাম না। অতএব একটি বাঁশ সঞ্চার করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম এবং তাহার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। সম্মুখে একটা বাগির টিপি ছিল, সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চিৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ তো দূরের কথা একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কী একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে।



চারুপাঠ

ইন্দ্র চিংকার করিয়া ডাকিল, ‘নতুনদা।’ নতুনদা গলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—‘এই যে আমি।’ দুজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম, কুকুরগুলি সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র বাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ-নিমজ্জিত মূর্ছিত-প্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাহার একটা পায়ে বহু মূল্যবান পাম্প-সু, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা চলিয়া গেলে গ্রামের কুকুরগুলি তাহার অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তিনি জলে বাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাহাকে চাঙা করিয়া তুলিতেও সে রাত্রে আমাদেরকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়া প্রথম কথা কহিলেন, ‘আমার একপাটি পাম্প?’

শব্দার্থ

দস্তানা	— হাতের মোজা।	নিষ্ফল	— ব্যর্থ।
জাঁকিয়া	— দম্ভ সহকারে চেপে বসা।	সংশয়	— সন্দেহ, দ্বিধা।
প্রসন্ন	— খুশি, সন্তুষ্ট।	অকস্মাৎ	— হঠাৎ।
অপ্রতিভ	— লজ্জিত, বিব্রত, অপ্রস্তুত।	নিরস্ত	— বিরত, ক্ষান্ত, থামানো।
রূপার	— গরম চাদর।	সম্ভর্পণে	— সাবধানে, সতর্কতার সঙ্গে।
আলোয়ান	— গরম চাদর।	উজান	— স্রোতের উল্টো দিক, জোয়ার।
আকণ্ঠ	— কণ্ঠ পর্যন্ত, গলা পর্যন্ত।	অগ্নিশর্মা	— রেগে আগুন, অত্যন্ত রাগী।
নিমজ্জিত	— ডুবে থাকা, নিমগ্ন।	গুণ	— নৌকা টানার দড়ি।
অদৃষ্টপূর্ব	— যা আগে দেখা যায়নি।	দুর্দান্ত	— দুরন্ত, প্রচণ্ড সাহসী।
পরিষ্কৃত	— স্পষ্টভাবে প্রকাশিত।	পাম্প-সু	— একধরনের জুতা।
রিক্তহস্তে	— খালিহাতে।	সংকীর্ণ	— চওড়া নয় এমন, অপ্রশস্ত।
অব্যক্তস্বরে	— অস্পষ্ট কণ্ঠে, বোঝা যায় না এমন উচ্চারণে।		
খোঁটামোটা	— এখানে মুড়িকড়াই যারা ভাজে অবজ্ঞাভরে তাদেরকে খোঁটামোটা বলা হয়েছে।		
প্রায়শ্চিত্ত	— পাপ বা অন্যায়কর্ম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় শাস্তিমূলক কাজ বা নিয়ম পালন, চিত্তশুদ্ধি।		

পাঠ-পরিচিতি

এই গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) থেকে কিছুটা সর্গক্ষিপ্তাকারে সংকলিত হয়েছে।

এই গল্পে নতুনদার চরিত্রের মাধ্যমে লেখক উৎকট স্বার্থপরতার মূর্তিমান ছবি ঐকেছেন।

নতুনদা ইন্দ্রনাথের দূর-সম্পর্কের দাদা। কলকাতার বাবু বলে তার গর্বের সীমা নেই। মোজা, জুতো, দস্তানা, গলাবন্ধ, টুপি, ওভারকোট সমস্ত শরীর ঢাকার পরও ইন্দ্রনাথের চাদরটি নিতে তার বাধেনি। ইন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীকান্তের সাথে তিনি যে ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত জঘন্য ও অমানবিক। সেই রাতে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথকে অহেতুক কষ্ট দিতে তার একটুও দ্বিধা হয়নি। বরং নানাভাবে তিনি তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। নানা খুঁত আবিষ্কার করে তাদের নানা কট্টক্টিও করেছেন।

এই নির্গঞ্জ স্বার্থপর লোকটি শেষপর্যন্ত যেভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে তা নিঃসন্দেহে তার স্বার্থপরতার যোগ্যতম শাস্তি।

নতুনদা চরিত্রে শরৎচন্দ্র বিলাসিতা, অহমিকা, স্বার্থপরতা, ভোগপ্রবণ মানসিকতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের যে ছবি ঐকেছেন বাংলাসাহিত্যে তার জুড়ি নেই।

লেখক-পরিচিতি

১৯০৭ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘বড়দিদি’ নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের নাম ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তা পড়ে পাঠকরা এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, অনেকেই ভেবেছিলেন এটি আসলে রবীন্দ্রনাথের বেনামি রচনা। এরপর একের-পর-এক উপন্যাস লিখে শরৎচন্দ্র বাঙালি পাঠকের মন জয় করেন। তিনি এখনও বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক।

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘শ্রীকান্ত’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘পথের দাবী’, ‘গৃহদাহ’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘দেবদাস’ ইত্যাদি। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’। এটি ইংরেজি, ইতালীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগন্নারীণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি।

বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ‘অপরাজেয় কথাশিল্পী’ হিসেবে। শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে আর মৃত্যু ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায়।

অনেক প্রতিভাবানের মতো শরৎচন্দ্রের নিজস্ব কিছু খেয়ালি শখ ছিল। দামি কাগজ ও সরু নিবওয়ালা কলম না হলে তিনি লিখতেন না। আর ঘরে পুষতেন পাখি, কুকুর, কাঠবিড়ালি।

20

ইন্দ্রের অবস্থা সংকট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ‘ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?’ বাবু অমনি দাঁতমুখ ভেংচাইয়া বলিলেন, ‘তবে যাও না, টানো গে নাহে! জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন?’

ক. উদ্ভূতশটুকুর লেখক কে?

খ. ‘দাঁড়! কারুর সাধি নেই নতুনদা, এই স্রোত ঠেলে উজান বেয়ে যায়’। –উদ্ভূতিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ভূতশ্রেণি উল্লেখিত ‘দাঁড় টানা’ ও ‘গুণ টানা’ –নৌকা চালানোর এই কৌশলের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক বলে তুমি মনে কর – যৌক্তিক উপস্থাপন কর।

ঘ. ‘তবে যাও না, টানো গে নাহে! জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন?’–এই উক্তি অবলম্বনে নতুনদা-এর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘নতুনদা’ গল্পের মূল চরিত্র একজন শহুরে বাবু। আধুনিক পোশাকাদি পরিহিত বাবুর অহংকারের শেষ নাই। শীত নিবারণের নানা উপকরণ থাকলেও তিনি নৌকার মাঝি ছোটছেলেটির গায়ের চাদর নিয়ে তার নিজ বসার কাজে ব্যবহার করেন। ইন্দ্রনাথ তার আত্মীয়। কিন্তু তার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি তার নাই। ইন্দ্রনাথ সর্বক্ষণই ব্যস্ত বাবুর প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনে, তথাপি তিনি তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকেন। চরম দুঃসময়ে ইন্দ্রনাথ বাবুকে নৌকার হাল ধরে একটু সাহায্য করতে বললে তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। চরম স্বার্থপর এ বাবুটির কৃতকর্মের যথার্থ শাস্তি প্রাকৃতিকভাবে প্রদত্ত হয়।

ক. নতুনদা গল্পের শহুরে বাবুটির সঙ্গে ইন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক ?

খ. উদ্ভূতশ্রেণি নতুনদার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।

গ. উদ্ভূতশ্রেণি বিপরীতধর্মী যে দুটি চরিত্রের ইঙ্গিত করা হয়েছে তার কোনটি সুশীল নাগরিক গঠনে অনুসরণীয় বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ঘ. উদ্ভূতশ্রেণির আলোকে শহুরে বাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

মাদার তেরেসা

সন্জীদা খাতুন



মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সবসময়ে তেমন দেখা যায় না। আবার বিভিন্ন যুগে এমন মানুষও পৃথিবীতে আসেন যারা মানুষের সেবাতেই প্রাণমন সব ঢেলে দেন। ভালোবাসা দিয়ে তাঁরা জয় করে নেন দুনিয়া। মাদার তেরেসা ছিলেন তেমনি এক অসাধারণ মানবদরদি।

মাদার তেরেসা জন্মেছিলেন অনেক দূরের দেশ আলবেনিয়ার স্কপিয়েতে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন বাড়িঘর তৈরির কারবারি, নাম নিকোলাস বোজাঝিউ। মায়ের নাম দ্রানাফিল বার্নাই। পারিবারিক পদবি অনুসারে কন্যার নাম রাখা হয় অ্যাগনেস গোনজা বোজাঝিউ। তিন ভাইবোনের মধ্যে অ্যাগনেস ছিলেন ছোট। বড় হয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সময় তাঁর নাম হল মাদার তেরেসা।

তেরেসা যখন খুব ছোট, তখন ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধকে বলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু তেরেসার কোমল মনে খুব আঘাত করেছিল। এদিকে ১৯১৭ সালে বাবার মৃত্যু পরিবারেও বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে বড় হচ্ছিলেন তেরেসা। অল্পবয়সে তাঁর ভেতরে ইচ্ছা জাগে মানুষের সেবা করবেন, তাদের কষ্ট লাঘব করবেন।

১৯২৮ সালে ১৮ বছরের তরুণী তেরেসা ‘লরেটো সিস্টার্স’ নামে খ্রিস্টান মিশনারি দলে যোগ দেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে এরা কাজ করতেন। দার্জিলিং-এ ‘লরেটো সিস্টার্স’দের আশ্রমে তিন বছর তিনি সন্ন্যাসিনী হওয়ার প্রশিক্ষণ নেন। বাঙালিদের মধ্যে কাজ করার জন্য বাংলাভাষাও রপ্ত করেন। এরপর কলকাতায় সেন্ট মেরি’জ স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব পান। ১৭ বছর সেখানে কাজ করেন তিনি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেবার আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করতেন তেরেসা। সপ্তাহে একদিনের টিফিনের পয়সা বস্তির দরিদ্র শিশুদের জন্য খরচ করতে উৎসাহ দিতেন তাদের।

বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মাদার তেরেসাকে খুব বিচলিত করছিল। মানুষের সেবায় আরও কাজ করার জন্য মনে খুব তাগিদ অনুভব করছিলেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালে লরেটো থেকে বিদায় নিয়ে তিনি শুরু করলেন একেবারে গরিবদের সেবার কাজ। গাউন ছেড়ে পরলেন শাড়ি—বাঙালি নারীর পোশাক। সেই থেকে তিনটির বেশি শাড়ি তার কখনও ছিল না। একটি পরবার, একটি ধোয়ার, আরেকটি হঠাৎ দরকার কিংবা কোনও উপলক্ষের জন্য রেখে দেওয়া। তাঁর হাতে টাকা-পয়সাও বিশেষ ছিল না। তবে মনে ছিল গরিব-দুখি মানুষের জন্য ভালোবাসা আর প্রবল এক আত্মবিশ্বাস।

কলকাতার এক অতি নোংরা বসতিতে তিনি প্রথম স্কুল খুললেন। বেঞ্চ-টেবিল কিছু নেই, মাটিতে দাগ কেটে শিশুদের শেখাতে লাগলেন বর্ণমালা। অসুস্থদের সেবার জন্য খুললেন চিকিৎসাকেন্দ্র। ধীরে ধীরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অনেক মানুষ। মাদার তেরেসার কাজের পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন আরও অনেক সন্ন্যাসিনী। তাদের নিয়ে তিনি গড়লেন মানবসেবার সংঘ — ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’।

সবচেয়ে যারা গরিব, সবচেয়ে কলুষ যাদের জীবন, তাদের সেবা করার ব্রত ছিল মাদার তেরেসার। মৃত্যুমুখী অসহায় মানুষের সেবার জন্য তিনি ১৯৫২ সালে কলকাতার কালীঘাটে ‘নির্মল হৃদয়’ নামে এক ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার ফুটপাথে সহায়-সম্মলহীন বহু মানুষের বাস। অসুখে ঝুঁকে ঝুঁকে তাঁদের অনেকের প্রায় মৃত্যুদশা। মরণাপন্ন এইসব মানুষকে বুকে তুলে নেন মাদার তেরেসা। নির্মল হৃদয়ে এনে মমতাময়ী মা কিংবা বোনের মতো তাদের সেবায়ত্ম করেন।

রাস্তা থেকে তুলে আনা অনাথ শিশুদের আশ্রয় দিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘শিশু ভবন’। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্থাপন করেন ‘নবজীবন আবাস’।

মাদার তেরেসার আরেকটি বড় কাজ কুষ্ঠরোগীদের আবাসন ‘প্রেমনিবাস’ প্রতিষ্ঠা। ভারতের টিটাগড়ে তিনি প্রথম এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর আরও অনেক শাখা গড়ে তোলা হয়। কুষ্ঠরোগীদের শরীরে দুর্গন্ধময় দগদগে ঘা হয় বলে সমাজে অনেকে রোগীকে পরিত্যাগ করে। অসুখটা হোঁয়াচে ভেবে রোগীর কাছ থেকে সবাই দূরে থাকে। ফলে কুষ্ঠরোগীদের জীবন হয়ে ওঠে খুব কষ্টের। মাদার তেরেসা নিজের হাতে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতেন। তাঁদের ঘা ধুইয়ে স্নান করিয়ে দিতেন। তাঁর সেবাকর্ম অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করত। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’-র সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। ভারতের বাইরে আরও অনেক দেশে তাদের সেবাকাজ শুরু হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রায় এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে তারা দেশ ত্যাগ করেছিল। শরণার্থী শিবিরে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ রাখা খুব সহজ কাজ ছিল না। সেই সময়ে শিবিরের দুর্গত মানুষের সেবার কাজ করেন মাদার তেরেসা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশে শুরু করেন তাঁর ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’-র সেবাকাজ। ঢাকার ইসলামপুরে প্রথম শাখা গড়ে তোলা হয়। এরপর খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, সিলেট আর কুলাউড়াতে ‘নির্মল হৃদয়’ ও ‘শিশুভবন’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯১ সালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের পর একাশি বছর বয়সী মাদার তেরেসা বাংলাদেশে ছুটে আসেন। তিনি চেয়েছিলেন নিজহাতে দুর্গত মানুষের ত্রাণের কাজ করবেন।

ভালোবাসা দিয়ে মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্য কাজ করে গেছেন মাদার তেরেসা। সেবাকাজে মানুষকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেছিলেন তিনি। ধর্মের ফারাক, দেশের ভিন্নতা, জাতির পার্থক্য তিনি কখনও বিবেচনায় নেননি। তাই সব দেশের সব ধর্মের মানুষের ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। সেবাকাজের জন্য বহু সম্মাননা তিনি লাভ করেছেন, তার ভিতরে শ্রেষ্ঠ হল নোবেল পুরস্কার। সে পুরস্কার শান্তির কাজের জন্য। জীবনে কোনো পুরস্কারের অর্থই নিজের জন্য ব্যয় করেননি মাদার তেরেসা, নোবেল পুরস্কারের অর্থও দান করেছেন দুঃখীজনের জন্য। সেইসাথে

চারুপাঠ

আরেকটি কাজ করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে সুইডেনের নোবেল কমিটি এক ভোজসভার আয়োজন করে। মাদার তেরেসা অনুরোধ করেছিলেন ভোজসভা বাতিল করে সেই অর্থ ক্ষুধার্ত মানুষদের দেয়ার জন্যে। এই সংবাদ জানতে পেরে সুইডেন ও অন্যান্য দেশের মানুষ এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রীও ছিল। তাঁরা মাদার তেরেসাকে যে সাহায্য করেছিলেন সেটা ছিল নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্যের অর্ধেক।

১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মাদার তেরেসার মৃত্যু হয়।

সারা জীবন তিনি মানুষের সেবা করেছেন, মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। নীলপাড়া সাদা শাড়িপরা ছোটখাটো এই মানুষটিকে তাই দুনিয়ার সবাই এক ডাকে চেনে। মানুষের মনে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

শব্দার্থ

মানবদরদি	- মানুষের জন্য যার দরদ বা সমবেদনা আছে এমন।
সন্ধ্যাসব্রত	- সংসারজীবন ত্যাগ করে তপস্যা ও সংযমের সাধনা।
মিশনারি	- মানুষের সেবার জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য।
প্রশিক্ষণ	- হাতে-কলমে বিশেষ শিক্ষা।
রস্ত	- অভ্যাসের সাহায্যে আয়ত্ত।
গাউন	- মহিলাদের বিশেষ ধরনের পোশাক।
মিশনারিজ অব চ্যারিটি	- পরের উপকারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান, মানবসেবা সংঘ।
ব্রত	- সৎকাজ করার জন্যে কঠিন সাধনা ও ত্যাগ।
আবাসন	- বসবাসের ব্যবস্থা।
সম্মাননা	- সম্মান দেখানো। সম্মানের স্বীকৃতি প্রদান।

পাঠ পরিচিতি

মাদার তেরেসা একজন অসাধারণ মানবসেবী। তাঁর সেবার কাজ কোনো এক দেশ বা সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। আমাদের বাংলাদেশ থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবী জুড়েই তাঁর সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেখানে রোগ, দুঃখ, দারিদ্র্য, অসহায়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সেখানেই মাদার তেরেসা তাঁর সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেবার ব্রত নিয়েই তিনি সারা জীবন ব্যস্ত থেকেছেন। বাংলার মানুষের জন্য তাঁর বিশেষ দরদ ছিল বলে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তিনি বাঙালির জীবনকে শান্তিতে ভরে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

শান্তির এই সাধককে সমস্ত পৃথিবী শ্রদ্ধা জানিয়েছে। নোবেল পুরস্কারের মতন বড় পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছে। জীবনের যত পুরস্কার তিনি পেয়েছেন তাঁর সমস্ত অর্থই খরচ করেছেন মানবসেবার কাজে। মানুষকে ভালোবেসে তিনি নিজেও মানুষের ভালোবাসার পাত্রী হয়েছেন।

লেখক-পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রফেসর সন্জীদা খাতুন প্রধানত প্রবন্ধকার এবং গবেষক। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। জন্ম ১৯৩৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল, ঢাকায়। সন্জীদা খাতুন সাহিত্য ও গবেষণাকর্মের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের রবীন্দ্রসংগীত পুরস্কার পেয়েছেন। সংগীতে পেয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ‘সত্যেন্দ্র কাব্য-পরিচয়’ ‘রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ’, ‘ধ্বনি থেকে কবিতা’, ‘অতীত দিনের স্মৃতি’, উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাদার তেরেসার জন্ম তারিখ কোনটি ?

ক. ২৬শে আগস্ট, ১৯১০

খ. ২৬শে আগস্ট ১৯১৪

গ. ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

ঘ. ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

নিচের অংশটুকু পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

১০ বছরের আবীর অন্যান্য শিশুদের মতো স্বাভাবিক শিশু নয়। জন্মের কিছুদিন পরই তার অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। আবীরের পিতামাতা চিন্তিত।

২. আবীরদের মতো শিশুদের জন্য মাদার তেরেসা যে-ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল—

i. মৃত্যুমুখী মানুষের সেবা করা

ii. প্রতিবন্দী শিশুদের আশ্রয় দেয়া

iii. অসহায় মানুষের আশ্রয় দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. আবীরের মতো শিশুদের জন্য মাদার তেরেসা স্থাপন করেন—

ক. নবজীবন আবাস

খ. শিশুভবন

গ. প্রেমনিবাস

ঘ. নির্মল হৃদয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভালোবাসা দিয়ে মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্য কাজ করে গেছেন মাদার তেরেসা। সেবাকাজে মানুষকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেছিলেন তিনি। ধর্মের ফারাক, দেশের ভিন্নতা, জাতির পার্থক্য তিনি কখনও বিবেচনায় নেননি। তাই সব দেশের সব ধর্মের মানুষের ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। সেবাকাজের জন্য তিনি সম্মাননা লাভ করেছেন, তার ভিতরে শ্রেষ্ঠ হল নোবেল পুরস্কার। ...

চারুপাঠ

সারা জীবন তিনি মানুষের সেবা করেছেন, মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। নীলপাড়া সাদা শাড়ি-পরা ছোটখাটো এই মানুষটিকে তাই দুনিয়ার সবাই এক ডাকে চেনে। মানুষের মনে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

- ক. পারিবারিক পদবি অনুসারে মাদার তেরেসার নাম কী রাখা হয়েছিল ?
- খ. ‘মানুষের মনে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল’—কেন? বুঝিয়ে লেখ।
- গ. ‘সারা জীবন তিনি মানুষের সেবা করেছেন, মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর সেবামূলক কাজ কীভাবে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে আলোচনা কর।

অথবা,

উদ্ভূত্যাংশে বর্ণিত মাদার তেরেসার ‘মানব সেবামূলক কাজ’ কীভাবে অন্যদের/ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবে?

অথবা,

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা কী ধরনের সেবামূলক কাজ করতে পারে?

- ঘ. ‘ধর্মের ফারাক, দেশের ভিন্নতা, জাতির পার্থক্য তিনি কখনও বিবেচনায় নেননি’ উদ্ভূতির আলোকে মাদার তেরেসার বিশ্বমানব কল্যাণচিন্তার পরিচয় দাও।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বেগম রহমান মাদার তেরেসার আদর্শে উজ্জীবিত একজন নারী। তাই যেখানে অসহায়তা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেখানেই বেগম রহমানের সরব উপস্থিতি। মাদার তেরেসার কর্মময় জীবন থেকে তার উপলব্ধি হয়েছে যে মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে।

- ক. মাদার তেরেসা কে ?
- খ. ‘বেগম রহমান মাদার তেরেসার আদর্শে একজন উজ্জীবিত নারী’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?
- গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা যায়— তা বর্ণনা কর।
- ঘ. ‘মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে’ —বেগম রহমানের এ উপলব্ধির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।



সাগরজলের নানা প্রাণী

আব্দুল্লাহ আল-মুতী

পশ্চিমের আকাশ লাল আলোয় ভাসিয়ে দিনের সূর্য অস্ত যায়। ডানা মেলে পাখিরা নিছ নিছ ঘরে ফিরে আসে। ধীরে ধীরে শান্ত পায়ে অশ্বকার নামে চারদিকে, জীবনের বিচিত্র কলরোল-কোলাহল যায় থেমে।

থামে না শুধু সাগরের অশান্ত কল্লোল। দিন নেই, রাত নেই, বহু দূরের পথ পেরিয়ে আসে অস্তহীন ঢেউ-এর সারি। তারপর একের পর এক গর্জন করে আছড়ে পড়ে তীরের ওপর।

এই যে বিশাল সাগর তা প্রাণেরও বিপুল ভান্ডার। সারা দুনিয়ার যত প্রাণী আর উদ্ভিদ আছে, পরিমাণের দিক দিয়ে তার প্রায় ছত্তাগের পাঁচ ভাগই রয়েছে সমুদ্রে। পানির পরিবেশ প্রাণের পক্ষে যেমন আরামের, এমন আর কোথাও নয়।

গভীর সাগরের তলায় রয়েছে এমন সব পাহাড়-পর্বত যা পৃথিবীর ওপরকার সব পাহাড়-পর্বতকে হার মানায়।

ভাঙার ওপর জীবজন্তু বাস করবার মতো যতখানি জায়গা রয়েছে, সমুদ্রে রয়েছে তার চাইতে অন্তত তিন-চারগুণ বেশি জায়গা। সমুদ্রে নানারকম প্রাণী বাস করে, একেবারে পানির ওপর থেকে গভীর তলা পর্যন্ত।

সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে অতি ভয়াবহ হল দানবাকার স্কুইড। পৃথিবীতে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এত বড়, এত দ্রুতগতি আর এমন মারাত্মক প্রাণী আর নেই। আকারে এর কোনো কোনোটা তিমির সমান হয় আর মরণপণ যুদ্ধে প্রায় যে, কোনো সামুদ্রিক জীবকে হারিয়ে দিতে পারে।

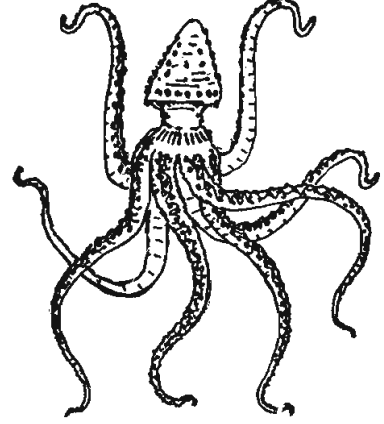
স্কুইড ও অক্টোপাসের মধ্যে একটা দিক দিয়ে মিল আছে। সে হল এদের অনেকগুলো করে নরম আঁকশির মতো লম্বা পা রয়েছে। অক্টোপাস কথাটার অর্থও হল আট পা-ওয়ালা।

স্কুইডের শরীরটা টর্পেডোর মতো, আর লেজের দিকটা তীরের মতো সূচালো।

চারুপাঠ

অষ্টোপাসরা স্কুইডদের জ্ঞাতিভাই হলেও তাদের শরীর টর্পেডোর মতো নয়, কেমন বলমলে থলের মতো। তাই তারা অত তাড়াতাড়ি চলাচল করতে পারে না। অষ্টোপাসের চেহারা বীভৎস হলেও আসলে এরা ভিত্তু আর ঠান্ডা মেজাজের প্রাণী; সাধারণত মানুষ-জন দেখলেই পালিয়ে যায়।

শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্কুইড আর অষ্টোপাস একরকম কালির মতো জিনিস ছুড়ে দিয়ে তার আড়ালে পালিয়ে যায়। এছাড়া এরা চোখের পলকে এদের চিত্র-বিচিত্র শরীরের রং পাল্টাতে পারে। ফলে তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়।



সাগরে মেবুদভী প্রাণীদের মধ্যে পড়ে হাজার হাজার রকমের মাছ। এক হাঙর মাছই আছে প্রায় আড়াইশো জাতের। হাঙর লম্বায় ছ ইঞ্চি থেকে পঁয়তাল্লিশ ফুট পর্যন্ত হয়। এদের দাঁত আর চোয়াল অত্যন্ত মজবুত। কিন্তু শরীরে কাঁটার বদলে রয়েছে শুধু নরম হাড়।

হাঙরের মুখে করাতির দাঁতের মতো ধারালো চার থেকে ছ পাটি দাঁত থাকে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এদের কোনো বাহ-বিচার নেই। পানিতে অতি সামান্য পরিমাণে রক্তের নিশানা পেলে তারা খাবারের উল্লাসে একেবারে হন্যে হয়ে ওঠে। হাঙরের পেটে মানুষের হাত-পা, কাঠের টুকরো, কয়লার বস্তু, গরুর মাথার খুলি, টিনের কৌটা, ভাঙা অ্যালার্ম ঘড়ি ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিস পাওয়া গেছে।

হাঙরের এক জাতভাই হল করাতি মাছ। এরা লম্বায় সাধারণত ষোল ফুট পর্যন্ত হয়। বড় জাতের করাতি মাছ লম্বায় হয় প্রায় বাইশ ফুট, আর তার নাকের সামনে দুধারে দাঁত বসানো করাতিটা লম্বায় হয় ছ ফুট পর্যন্ত।

এমনি আর এক মাছ হল ‘রে’। এরা এমন চ্যাপ্টা চেহারার যে এদের দেখলে মাছ মনে না হয়ে বরং বিশাল প্রজাপতি বা বাদুড়ের কথা মনে হবে। দুপাশের পাখনা চওড়া হতে হতে পাখায় পরিণত হয়েছে। এরা যখন বিরাট বিরাট পাখা দুলিয়ে পানিতে সাঁতরায় তখন মনে হয় যেন পাখি উড়ছে। দিনের বেলা এরা পানির তলায় কাদায় গা ঢাকা দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, রাতে শিকার ধরতে বেরোয়।

বিজলি রে বা টর্পেডো লম্বায় ছ ফুট আর দুশ পাউন্ড পর্যন্ত ভারি হয়। এদের দুপাশের পাখায় থাকে দুটো বিজলি তৈরির ব্যাটারি। কোনো কোনো রে শক্তিশালী বিজলি তৈরি করতে পারে যা একজন মানুষ বা একটা বেশ বড় মাছকে কুপোকাত করবার পক্ষে যথেষ্ট।

সাগরে সবচাইতে দ্রুতগামী প্রাণী হল টুনা মাছ। টুনা মাছ ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্যন্ত ছুটেতে পারে। কোনো কোনো টুনা লম্বায় হয় চৌদ্দ ফুট আর ওজনে প্রায় বিশ মণ। টুনা মাছের জাতভাই হল তলোয়ার মাছ। সব গরম দেশের সমুদ্রে এরা ঘুরে বেড়ায়। লম্বায় এরা আঠারো ফুটের ওপর আর ওজনে সাতাশ মণের ওপর ভারী হয়। শক্ত কাঁটাওয়ালা এত বড় মাছ আর নেই। অনেক সময় এরা লম্বা ধারালো তলোয়ার বিধিয়ে মাঝারি আকারের নৌকা ডুবিয়ে দিতে পারে।

সাগরের সবচাইতে বড় প্রাণী হল নীলতিমি। তিমি আছে প্রায় এক শ জাতের। কোনো কোনো জাত চার-পাঁচ ফুটের চেয়ে বড় হয় না। এর মধ্যে শূশুক জাতীয় প্রাণীরাও পড়ে। কিন্তু নীলতিমির কথা আলাদা। এর এক-একটা লম্বায় হয় প্রায় এক শ ফুট পর্যন্ত। আর ওজন ? তাও এক শ দেড় শ টন। অর্থাৎ গোটা তিরিশেক হাতি বা দুহাজার প্রমাণ সাইজের মানুষের সমান।

নীলতিমি শুধু যে আজকের দুনিয়ারই সবচেয়ে বড় প্রাণী তা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় জানোয়ার আর কখনও সৃষ্টি হয়নি।

তিমি পানিতে থাকে বলে সচরাচর লোকে একে বলে মাছ। কিন্তু আসলে এরা স্তন্যপায়ী। মাছের মতো তিমি ডিম পাড়ে না; আস্ত বাচ্চার জন্ম দেয়, আর তাকে দুধ খাইয়ে বড় করে।

এমন বিরাট চেহারা যে জন্তুর তার খিদেটাও তো হবে তেমনি মানানসই। কিন্তু মজার ব্যাপার হল ছোট ছোট কয়েক জাতের তিমির দাঁত থাকলেও খুব বড় জাতের যেসব তিমি তাদের কারও দাঁত নেই। দাঁতের বদলে তাদের অতি বিরাট মুখের মধ্যে রয়েছে পাতলা হাড়ের তৈরি এক বিশাল জাল। মুখের হা খোলা রেখে তিমি যখন পানিতে এগিয়ে চলে তখন এই জালের ফাঁকে আটকা পড়ে প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট প্রাণী আর প্লাঙ্কটন। আর মাঝে মাঝে তিমি তার বিরাট জিভ দিয়ে চেটেপুটে এগুলো চালান করে দেয় তার পেটের গহ্বরে। এই জিভের ওজনও একটা ছোটখাটো হাতির সমান।

দাঁতালো জাতের তিমিদের মধ্যে বড়সড় আকারের হল স্পার্ম তিমি। বিরাট বিরাট স্কুইড আর অক্টোপাস হল এদের প্রিয় খাবার। আর শিকার ধরার জন্যে এরা একটুবে পানির আধমাইল পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। তারপর শিকারকে কামড়ে ধরে আস্ত গিলে ফেলে। সাগরের এক বিশাল দৈত্য আজ মানুষের শিকারে পরিণত হয়ে দিন দিন সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। এক-একটা নীলতিমির চর্বি থেকে প্রায় পঁচিশ টন তেল পাওয়া যায়। প্রায় একশত টন ওজনের কলজেটা ‘ভিটামিন-এ’ তৈরিতে লাগে। অনেক দেশের লোক তিমির মাংস খায়।

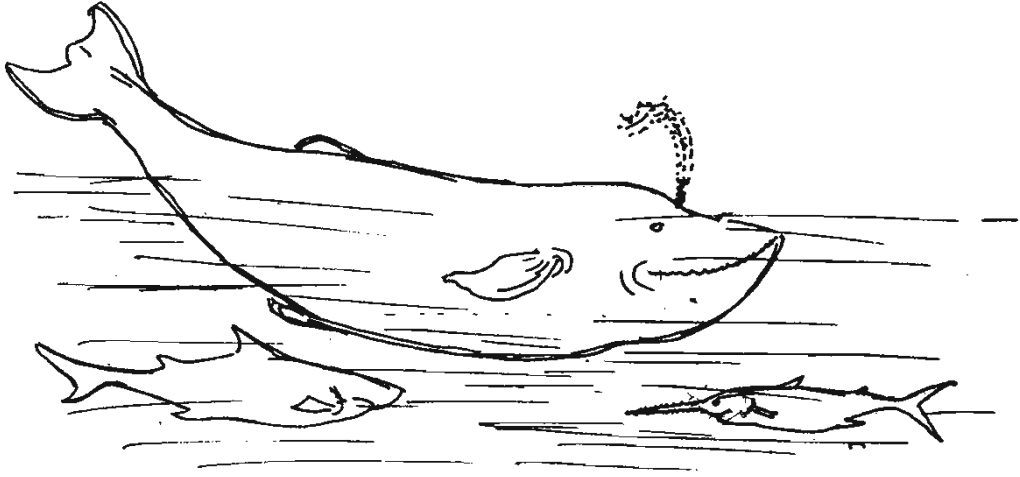
পানির তিন হাজার থেকে দশ হাজার ফুট নিচে দেখা যায় এক ধরনের ভয়ংকর অক্টোপাস। কালির মতো কালো এদের দেহ, সাদা হাতির দাঁতের মতো চোয়াল, রক্তের মতো লাল বিশাল এদের চোখ। এদের দশটা করে পা কালো জাল দিয়ে জোড়া লাগানো।

সাগরের তলায় যেমন আলোর অভাব তেমনি অভাব খাবারের। কাজেই অধিকাংশ প্রাণীর সেখানে রাক্ষুসে খিদে। কোনো কোনো জীবজন্তুর এমন বিরাট হা যে তারা নিজের চেয়েও বড় আকারের মাছ গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। এদের দাঁত থাকে ভেতরের দিকে বাঁকানো, যাতে শিকার সহজেই ভেতরে ঢুকতে পারে। আর পেট রবারের বেগুনের মতো—দরকার মতো যথেষ্ট ফুলে উঠতে পারে। এদের শরীর ছ ফুট লম্বা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বাও হতে পারে। একবার এমন ছ ইঞ্চি লম্বা এক বিরাট হা-ওয়ালা মাছের পেটে পাওয়া যায় ন ইঞ্চি লম্বা এক কডমাছ। একরকম কালো শিকারি মাছের অঙ্গগর সাপের মতো এমন বিশাল দাঁতালো চোয়াল আছে যে এরা নিজের চেয়ে তিনগুণ বড় মাছও গিলে ফেলতে পারে।

তিন-পা-ওয়ালা মাছ থাকতে পারে একথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু কোনো কোনো মাছের পেছনের দুটো পাখনা আর লেজ সত্যি সত্যি চেহারা পাল্টে লম্বা লম্বা পায়ে পরিণত হয়েছে। এমনি তিন-পা-ওয়ালা মাছ পায়ের ওপর ভর করে সাগরের তলায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন শিকার তার সামনে হাজির হবে আর সে অমনি টুপ করে গিলে খাবে।

গভীর সমুদ্রের মধ্যকার মাছেরা হয় অন্ধ, আর নইলে তাদের থাকে বিশাল চোখ। অনেকে নিজেরা আলো তৈরি করে—সে আলো জ্বালে আর নেভায়। কোনো কোনো মাছ শব্দও করে।

সমুদ্রের দুহাজার থেকে তিন হাজার গভীরতায় বেশির ভাগ মাছই আলো তৈরি করতে পারে। এর চেয়ে আরও প্রায় দুহাজার ফুট নিচে পর্যন্ত এমনি আলো-দেওয়া মাছ দেখতে পাওয়া যায়। নিচের দিকে আলো কম বলে সেখানে মাছেদের চোখ বড় হতে হতে, হয়ে দাঁড়ায় বিশাল। কোনো কোনো মাছের চোখ আবার দেখার সুবিধার জন্য মাথার



কোটর থেকে অনেকখানি বাইরে বেরিয়ে আসে। অবশ্য মানুষ যত দূরে দেখতে পায় মাছেরা মোটেই তত দূরে দেখতে পায় না। পানির তলায় বেশিদূরে দেখা সম্ভবও নয়।

গভীর সাগরের তলায় মাছেরা কী করে এমন উজ্জ্বল আলো তৈরি করে এটা বিজ্ঞানীদের কাছে এক রহস্য। কোনো কোনো মাছ এত উজ্জ্বল আলো তৈরি করে যে, তাতে কাছে বই রেখে পড়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন—জোনাকির আলো যেমন ঠান্ডা, মাছেদের এই আলোও তেমনি। পথ দেখা বা পরস্পরকে খুঁজে পাওয়া ছাড়াও এই আলোর সাহায্যে এরা শিকারকে আকৃষ্ট করে। কখনও কখনও প্রবল আলোর ঝলকানি দিয়ে শত্রুকে তাড়িয়েও দেয়।

শব্দার্থ

কলরোল	—	কলকল শব্দ, কোলাহল।
কল্লোল	—	শব্দময় ঢেউ।
অমেরুদণ্ডী	—	যার মেরুদণ্ড নেই।
বীভৎস	—	কদর্য বিকৃত।
নিশানা	—	চিহ্ন, লক্ষণ।
কুপোকাত	—	পরাজিত।
প্রমাণ সাইজ	—	বড়ও নয়, ছোটও নয় এমন মানসম্মত আকার।
প্রাজ্জটন	—	সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে ভাসমান অদৃশ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী বিশেষ।

পাঠ-পরিচিতি

পৃথিবীর বুকে বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রের তলায় হাজার হাজার ফুট নিচে পর্যন্ত রয়েছে হাজার প্রাণীর অস্তিত্ব। এই প্রবল লেখক সাগরতলার আশ্চর্য সব প্রাণীদের কথা বলেছেন। এইসব প্রাণীর মধ্যে রয়েছে দানবাকার স্কুইড, বীভৎস চেহারার অক্টোপাস, রক্তপিপাসু হাঙর, পাখাফোলানো রে মাছ, দ্রুততম মাছ টুনা, বৃহদাকার নীলতিমি, আলো-দেওয়া মাছ ইত্যাদি। এদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য লেখক সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন এ রচনায়। রচনাটি লেখকের ‘সাগরের রহস্যপুরী’ গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত করে সংকলিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

শিশুদের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আব্দুল্লাহ আল-মুতীর স্থান সবার ওপরে। বিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যময় অজানা দিককে তিনি আকর্ষণীয় ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

ছোটদের জন্যে তাঁর লেখা বইগুলো হচ্ছে ‘এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে’, ‘অবাক পৃথিবী’, ‘আবিষ্কারের নেশায়’, ‘রহস্যের শেষ নেই’, ‘জানা অজানার দেশে’, ‘সাগরের রহস্যপুরী’, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে’, ‘ফুলের জন্য ভালবাসা’ ইত্যাদি।

সাহিত্যরচনা ও বিজ্ঞানসাধনার জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ইউনেসকো আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ক্যাম্বারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

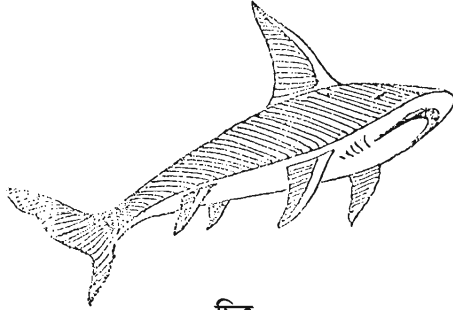
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাগরের সবচাইতে দ্রুতগামী প্রাণী হল—

- ক. টুনা মাছ
গ. বিজলি

- খ. হাঙর
ঘ. অক্টোপাস



চিত্র

২. উপরের চিত্রটি কোন প্রাণীর?

- ক. হাঙর
গ. নীলতিমি

- খ. করাত মাছ
ঘ. স্পার্মতিমি

৩. চিত্রের প্রাণীটির

- i. করাতের মতো ধারালো দাঁত আছে
ii. মুখে পাতলা হাড়ের তৈরি এক বিশাল জাল
iii. চর্বি থেকে প্রায় ২৫ টন তেল পাওয়া যায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
গ. ii

- খ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নীলতিমি শুধু যে আজকের দুনিয়ারই সবচেয়ে বড় প্রাণী তা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় জানোয়ার আর কখনও সৃষ্টি হয়নি। তিমি পানিতে থাকে বলে সচরাচর লোকে একে বলে মাছ। কিন্তু আসলে এরা স্তন্যপায়ী। মাছের মতো তিমি ডিম পাড়ে না; আস্ত বাচ্চার জন্ম দেয়, আর তাকে দুধ খাইয়ে বড় করে।

- ক. উদ্ভূতাত্ত্বিকের লেখক কে ?
- খ. নীলতিমির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
- গ. একটি তিমি মাছের ছবি আঁকো।
- ঘ. ‘পানিতে বাস করলেও তিমি আসলে মাছ নয়’ –কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রমিত তার বাবার সাথে বসে টিভিতে ‘সাগরতলের প্রাণীরাজ্য’ নামের একটি অনুষ্ঠান দেখছিল। অনুষ্ঠানটিতে ভয়ংকর আকৃতির এক বিরাট মাছ দেখে রমিত উত্তেজিত হয়ে তার বাবাকে প্রশ্ন করল, “বাবা ঐ ভয়ংকর আকৃতির মাছটি রক্তের গন্ধ পেয়ে এত উন্মাদ হয়ে গেল কেন? আচ্ছা বাবা তিমিমাছও কি এরকম হিংস্র হয়ে থাকে?” বাবা উত্তর দিল, “ঐ ভয়ংকর আকৃতির মাছটি সর্বভু ক এবং হিংস্র। কিন্তু তিমি আকারে বড় হলেও হিংস্র নয়। আর তিমি কোনো মাছ নয়।”

- ক. ভয়ংকর আকৃতির মাছটির নাম কী ?
- খ. মাছটি যে সর্বভু ক তা কীভাবে বুঝা যায়?
- গ. উদ্ভীপকের আলোকে সর্বভু ক মাছের বৈশিষ্ট্য তুলে ধর।
- ঘ. তিমি আসলে মাছ নয় –উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

নীলনদ আর পিরামিডের দেশ সৈয়দ মুজতবা আলী



সন্ধ্যার বোঁকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌঁছল।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আর আপন নীলে মিলে বেগুনি রং ধরে নিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর থেকে একশ মাইল পেরিয়ে আসছে মন্দমধুর ঠান্ডা হাওয়া।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পেছনে। সোনালি বালিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বুকে হানা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রং বদলাতে থাকে। তার একটা রং ঠিক চেনা কোন্ জিনিসের রং সেটা বুঝতে-না-বুঝতে সে রং বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রং ধরে ফেলে।

আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পেছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিশ্চুপ হয়ে আসছে।

মরুভূমির ওপর চন্দ্রালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সে দৃশ্য বাংলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভূতুড়ে বলে মনে হয়। চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন বাপসা আবছায়া পর্দায় ধাক্কা খেয়ে ধেমে যায়।

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু মাথা উঁচুতে ওঠে। জ্বলজ্বল দুটি ছোট সবুজ আলো। ওগুলো কী? ভূতের চোখ নাকি? শুনেছি ভূতের চোখই সবুজ রঙের হয়। না! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাতান—এ দেশের ভাষাতে যাকে বলে ‘কাফেলা’।

উটের চোখের ওপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখদুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। আর কেনই পাব না বল? মরুভূমি সম্মুখে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

যদি মোটর ভেঙে যায় ? যদি কাল সম্ভব্যে অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে ? স্পষ্ট দেখতে পেলাম এ গাড়ির রঙনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জ্বল সঙ্গে তুলে নেয়নি; তখন কী হবে উপায় ? ও, মরুভূমির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কল্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকটে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলে যাব ?

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কায়রো পৌঁছে গিয়েছি।

শহরতলিতে ঢুকলুম। খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। এই শহরতলিতেই কত না রেস্তোরাঁ, কত না ক্যাফে খোলা; খন্দেরে খন্দেরে গিসগিস করছে। রাত তখন এগারটা। আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখেছি। কায়রোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়েনি। কায়রোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম-ম করছে। মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয়, নেমে পড়ে এখানেই চাটি খেয়ে যাই। অবশ্য রেস্তোরাঁগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানের মতো নোখরা।

সবাই নিকটতম রেস্তোরাঁয় হুড়মুড় করে ঢুকলুম। কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর। তড়িঘড়ি তিনখানা ছোট ছোট টেবিল একজোড় করে চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবুর্চি ছুটে এসে



তোয়ালে কাঁধে বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালে। মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন—অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার। বারকোশে হরেক রকম খাবারের নমুনা। তাতে দেখলুম, রয়েছে মুরগি মুসল্লম, শিক কাবাব, শামি কাবাব আর গোটা পাঁচ-ছয় অজানা জিনিস। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছেভাজা, সোনামুগের ডাল, পটলভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য। অত-শত বলি কেন? শুধু ঝোল-ভাতের জন্য। কিন্তু ওসব জিনিস তো আর বাংলাদেশের বাইরে পাওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কী লাভ ?

আহরাদি সমাপ্ত করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলুম। ততক্ষণে আমরা কায়রো শহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি। গন্ডায় গন্ডায় রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা, ডানস্ হল। খন্দেরে খন্দেরে তামাম শহরটা আব্জাব করছে। কত জাত-বেজাতের লোক।

ঐ দেখ, অতি খানদানি নিগ্রো। ভেড়ার লোমের মতো কঁকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দুখানা ঠোঁট, বোঁচা নাক, ঝিনুকের মতো দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য। আমি জানি এরা তেল মাখে না। কিন্তু আহা, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে।

ঐ দেখ, সুদানবাসী। সবাই প্রায় ছ ফুট লম্বা। আর লম্বা আলখাল্লা পরেছে বলে মনে হয় দৈর্ঘ্য ছ ফুটের চেয়েও বেশি। এদের রং ব্রোঞ্জের মতো। এদের ঠোঁট নিগ্রোদের মতো পুরু নয়, টকটকে লালও নয়।

কায়রোতে বৃষ্টি হয় দৈবাৎ। তাও দু-এক ইঞ্চির বেশি নয়। তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল ক্যাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে। শুনলুম, এখানকার বায়স্কোপও বেশির ভাগ হয় খোলামেলাতে।

মোটরগাড়ি বড্ড তাড়তাড়ি চলে বলে ভালো করে সবকিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এইবার চোখের সামনে ভেসে উঠল অতি রমণীয় এক দৃশ্য। নাইল—নীলনদ।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের ওপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনি নৌকা—হাওয়াতে কাত হয়ে তেঁকোণা পাল পেটুক ছেলের মতো পেট ফুলিয়ে দিয়ে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয় নৌকাটা পেছনের ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয়। এই নীল তার বুকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়।

পিরামিড! পিরামিড!! পিরামিড!!!

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড? এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ। যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছে, দেয়ালে খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে।

মিশরে ভেতরে-বাইরে আরও পিরামিড আছে। কিন্তু গিজে অঞ্চলের যে তিনটে পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, সেগুলোই ভুবনবিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু বলে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমনকি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পঁচিশ ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হত, তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পঁচিশ ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু।

বোঝা যায়, দূরে চলে গেলে। গিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটে পিরামিড—সবকিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেঁইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। টুকরো বলতে একটু কমিয়ে বলা হল, কারণ এর চার-পাঁচ টুকরো একত্র করলে একখানা ছোটখাটো ইঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারো, ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এ পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানাতে সে দেয়াল লম্বায় ছশ পঞ্চাশ মাইল হবে।

সবচেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি একলক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায় কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয়, তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে ‘মমি’ বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হত যে, তার ভিতর ঢুকে কেউ যেন ‘মমি’কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে।

চারুপাঠ

নিদ্রিতের চোখে যেসকল পড়ে, আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়ল পশ্চিমাকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্তছটা আর পূর্বাকাশ থেকে নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস।

রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। রাস্তার দুদিকে দোকানপাট এখনও বন্ধ। দু-একটা কফির দোকান খুলি-খুলি করছে। ফুটপাথে লোহার চেয়ারের ওপর পদ্মাসনে বসে দু চারটি সুদানি দারোয়ান তসবি জপছে। খবরের কাগজগুলোর সামনে অল্প একটু ভিড়।

তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্য ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে। আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে জড়ানো জড়ানো হয়ে সবকিছুই যেন কিছু কিছু দেখা হল। সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের মিনারগুলোকে। এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নামাজের ঘর মসজিদের ওপর। মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকার্য আছে সেসকল করবার মতো হাত আজকের দিনে আর কারও নেই।

প্রকৃতির গড়া নীল, আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভূবনবিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পৃথিবীর বহু সমঝদার শুধুমাত্র এই মসজিদগুলোকেই প্রাণভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কায়রোতে আসেন।

[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

শব্দার্থ

নিষ্প্রভ	- প্রভাহীন, দীপ্তিহীন।	জাত-বেজাত	- নানা জাতি।
ভূতুড়ে	- ভূত-প্রেত সম্পর্কিত, রহস্যময়।	অতি রমণীয়	- খুব সুন্দর।
ক্যারাতান	- কাফেলা।	কীর্তিস্তম্ভ	- মহৎ অবদান স্মরণে নির্মিত সৌধ।
নিষ্কৃতি	- নিস্তার, রেহাই, অব্যাহতি।	পূর্বাভাস	- ভাবী ঘটনার সংকেত।
হুড়মুড়	- ঠেলাঠেলি করে ঢোকা বা বের হওয়ার ভাব নির্দেশক।	মমি	- কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহ।
গন্ডা	- চারটি।	চন্দ্রাস্ত	- চাঁদের অস্ত যাওয়া।
তামাম	- সমস্ত, পুরো।	অরুণোদয়	- সূর্যের উদয়।
আবজাব	- গিজগিজ, ঠাসাঠাসি।	ফোকটে	- ফাঁকতালে।

পাঠ-পরিচিতি

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মিশর। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মিশরের আবহাওয়া শুষ্ক বলে ঐ সভ্যতার অনেক নিদর্শন কালের কবলে হারিয়ে যায়নি। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি-বিশেষ করে কায়রো শহরের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান রচনায়। রচনাটি সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘জলে ডাঙায়’ গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত করে সংকলিত হয়েছে।

এ রচনায় এসেছে চারদিকে মরুভূমি-ঘেরা ঐতিহাসিক কায়রো শহর, কায়রোর অদূরে গির্জায় অবস্থিত পিরামিড ও মিশরের ভূবনবিখ্যাত মসজিদের প্রসঙ্গ। এসবের আকর্ষণে সারাবিশ্বের পর্যটকরা ছুটে যায় কায়রো অভিমুখে।

কায়রো শহর আলোয় ভরে যায় রাতের বেলায়। রেস্টোরাঁগুলো থেকে ভেসে আসা নানারকম খাবারদাবারের সুগন্ধ বাড়িয়ে দেয় পথচারীদের ক্ষুধা। অদূরেই গিজে শহরে রয়েছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার আকর্ষণ ও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি – মিশরের পিরামিড। পিরামিড নির্মিত হয়েছিল মিশরের প্রাচীন সম্রাট ফারাওদের মৃতদেহ মমি হিসেবে কবরস্থ করে রাখার জন্য। পাথরের টাই দিয়ে তৈরি বিশালাকার সমাধিস্তম্ভ এটি। নীলনদ আর পিরামিডের পরেই মিশরের অতুলনীয় আকর্ষণ হচ্ছে সেখানকার ভুবনবিখ্যাত অপূর্ব সৌন্দর্যময় মসজিদগুলো। এসবের টানেই সমঝদার আর ঘরছাড়া মানুষ ছুটে যায় মিশরে।

লেখক-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্যরচনাকার ও অনন্য গদ্যশৈলীর স্রষ্টা সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর জন্ম আসামের করিমগঞ্জে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহসান্নিধ্যে পাঁচ বছর লেখাপড়ার পর তিনি শান্তিনিকেতন থেকে স্নাতক হন। এছাড়া তিনি আলীগড় কলেজ, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ও কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেছেন।

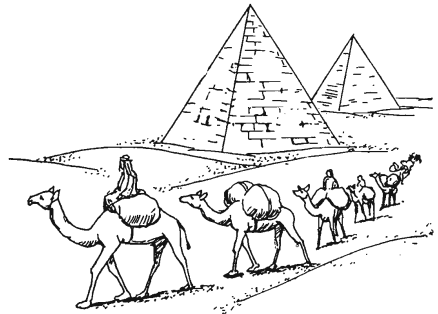
কর্মজীবনে তিনি কলকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাবুল কৃষি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন। ভ্রমণের নেশা ছিল তাঁর প্রবল। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন।

মুজতবা আলী ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদি প্রায় ১৫টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ৪টি উপন্যাস, ২টি গল্পগ্রন্থ এবং বেশকিছু রম্যরচনা ও ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন।

‘দেশে বিদেশে’ নামক বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীটি তিনি রচনা করেছেন কাবুল কৃষি কলেজে শিক্ষকতা করার সময়। কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর অন্যতম ভ্রমণ কাহিনী হচ্ছে ‘জলে ডাঙায়’। বৈঠকি চালে সরস কৌতুকময় রম্যরচনার জন্য সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন



পিরামিডের ছবি

- ছবিটি কোন দেশের?

ক. সৌদি আরবের	খ. মিশরের
গ. আফগানিস্তানের	ঘ. কুয়েতের
- ‘কায়রোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়েনি’-এর অর্থ :

ক. কায়রো শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন	খ. রাতে কায়রো শহরে চুরি হয়
গ. কায়রো শহর রাতে গতিশীল হয়	ঘ. কায়রো শহরের লোক রাত জেগে বিনোদন করে

চারুপাঠ

৩. সৈয়দ মুজতবা আলী মূলত—

ক. কবি

খ. নাট্যকার

গ. পর্যটক

ঘ. রম্যরচয়িতা

৪. 'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ, শীর্ষক রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?

ক. দেশে বিদেশে

খ. চাচা কাহিনী

গ. জলে ডাঙায়

ঘ. শবনম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

উটের চোখের ওপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখদুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। আর কেনই বা পাব না বল? মরুভূমি সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

ক. উদ্ভূতাত্মে কোন দেশভ্রমণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ?

খ. 'ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।' লেখক কেন ভয় পেয়েছিলেন ?

গ. উদ্ভূতাত্মটিকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর।

ঘ. উট পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর হবার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে মিশর একটি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মিশরের আবহাওয়া শুষ্ক, তাই এ সভ্যতার অনেক নিদর্শন কালের কবলে হারিয়ে যায়নি। এই সভ্যতার প্রাচীন শহর কায়রো। চারদিকে মরুভূমি, অদূরে গির্জায় অবস্থিত পিরামিড ও মিশরের ভূবনবিখ্যাত মসজিদ। এসবের আকর্ষণে সারা বিশ্বের পর্যটক ছুটে যায় কায়রো শহরে।

ক. মিশরের প্রাচীনতম সভ্যতার একটি নিদর্শনের নাম লিখ।

খ. আবহাওয়া শুষ্ক হলে সভ্যতার নিদর্শন নষ্ট হয় না কেন? আলোচনা কর।

গ. অনুচ্ছেদটির আলোকে কায়রো শহরের সঙ্গে তোমার জানা একটি শহরের তুলনা কর।

ঘ. কায়রো শহর পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় হবার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

৩. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সম্বন্ধে অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? স্পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ির রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয়নি; তখন কী হবে উপায় ?

ক. অনুচ্ছেদটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. 'যদি মোটর ভেঙে যায়?'- একথার অর্থ কী? বুঝিয়ে লিখ।

গ. অনুচ্ছেদটিতে যে পরিস্থিতির উল্লেখ আছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. 'এ গাড়ির রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয়নি' -উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ কর।

একসূত্রে

শওকত ওসমান



বিকেল থেকে আকাশে মেঘ জমেছিল।

এ জনপদের সবাই বেলাবেলি মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। গরু ছাগল গোয়ালে বাঁধা। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় শুরু হতে পারে।

বহু লোকই জমায়েত হয়েছে খাঁ-বাড়ির বিরাট দহজিলে। অবসর কাটানোর এমন সুযোগ রোজ রোজ পাওয়া যায় না। তাই কেউ তামাক খাচ্ছিল, কেউ গল্পগুজবে রত। কয়েকজন শণ দিয়ে দড়ি তৈরি করছিল। আরশাদ খাঁ প্রথমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জোরে কেশে নিলেন। কলগুঞ্জন একটু স্তিমিত হল। কারণ, এ গ্রামের সবাই জানে আরশাদ খাঁ এবার কিছু বলবেন। গ্রামের তিনি মুরুব্বি। বয়স ষাটের বেশি। দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেহটি এখনও মজবুত।

— অ করিম

আরশাদ খাঁ সম্মোধন করলেন।

— জি

— ইন্সপেক্টর সাহেব গ্যাছে গা ?

করিম আর একজনের সঙ্গে গল্প করছিল। হঠাৎ বাধা পড়ায় বিরক্ত হল, তাই অবহেলা-মিশ্রিত স্বরেই জবাব দিল ‘গ্যাছে গা’।

— কী কইলেন তিনি ?

— কী আর কইব। কয়, আপনারা সমবায় সমিতি বানান। ফসলের ভালো দাম পাইবেন, কর্জ পাইবেন। মহাজনের কাছে জমি-জিরাত বন্ধক দেওন লাগব না। এইসব হাবিজাবি কথা।

— হুঁ, তুই কিছু কইলি ?

— কী আর কইতাম চাচা। এই কথা কতই হুনছি। আপনেও হুনছেন। আমরা গা পাতলাম না। চইল্যা গ্যাছে ইন্সপেক্টর সাব।

— যাক গিয়া।

চারুপাঠ

তারপরই আরশাদ খাঁ আকাশের দিকে চাইলেন। তার মুখ দিয়ে অজান্তে বের হল, ‘করিম, জোর তুফান আইতে পারে’।

একথায় করিমের মুখে শঙ্কার ছায়া পড়ে। অন্যেরা খোশগল্পে মশগুল। তারা কিছুই শুনল না।

আরশাদ খাঁর আশঙ্কাই সত্য। হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধ হল সমস্ত পৃথিবী। জোরে তুফান শুরু হবে—এ তারই পূর্বাভাস।

আরশাদ খাঁর উপদেশমতো তাই যে-যার বাড়ির দিকে ছুটল। দহলিজ আবার শূন্য।

একটু পরে শুরু হল ঝড়। সমস্ত সৃষ্টি যেন উলটপালট হবার উপক্রম। শব্দশব্দ বাতাস গাছপালার ওপরে, টিনের ঘরে, খড়ো চালে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। শতসহস্র দৈত্য যেন নির্মম আক্রোশে সব চুরমার করে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রোধে বিকশিত দৈত্যকুলের দন্তপাটিরূপ বিদ্যুৎ আকাশের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে।

সমস্ত গ্রামবাসী ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে।

দোয়া-দরুদ পড়ছে বর্ষীয়ানরা।

কিন্তু ঝড় আর শান্ত হতে চায় না। ইসরাফিলের শিঙার আওয়াজে যেন পৃথিবী দীর্ঘবিদীর্ণ হচ্ছে। ওদিকে কুটিল রাতের ধাবার নিচে সমস্ত গ্রাম মুহ্যমান।

সমস্ত রাত এ প্রলয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল। পরদিন গ্রাম আর চেনা যায় না। লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, গোটা এলাকার জীবন।

দেখা গেল, অধিকাংশ ঘরের চাল নেই। গ্রামের প্রায় সবাই দরিদ্র। তাদের খড়ো ঘর, ঝড়ের দাপটে সেসব এদিক ওদিক উড়ে গিয়েছে।

ঘরে ঘরে হাহাকার। ঝড় থেমেছে। কিন্তু আকাশে তখনও জমাট মেঘ। রাতে তেমন বৃষ্টি ছিল না। কোনোরকমে বেড়া কি দেওয়ালের পাশে মানুষ মাথা গুঁজেছে। কিন্তু জোরে বৃষ্টি নামলে কী হবে? দুর্দশার আশঙ্কায় সবাই শিউরে উঠল।

খাঁ-বাড়ির দহলিজে চাল নেই। পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বাঁশবনের পাশে পড়ে রয়েছে।

তবুও এ জায়গায় গ্রামের বহু লোক জড়ো হয়েছে।

এখন কী করা যায়—সবার মুখেই এ প্রশ্ন। গ্রামে জনমজুর পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেই বা কী। প্রত্যেকটি কাজ অনড়। দু-চারজনের পক্ষে সম্পাদন একেবারেই অসম্ভব।

সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কয়েকজনের তো হাউমাউ কান্না।

আরশাদ খাঁ এই ভিড়ে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। চিন্তামগ্ন, নিস্তব্ধ। হঠাৎ তিনি হাত তুলতে অন্যান্যদের কথাবার্তা থেমে গেল।

আরশাদ খাঁ সম্বোধন করে বললেন, ‘ভাইসব মসিবতে কানলে হয় না। বুক জোর করা লাগে। আমি যা কই শোন’।

সবাই নিমগ্ন চিন্তে বৃষ্টির উপদেশ শোনে। সবারই দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ।

সংক্ষেপে তাঁর পরামর্শ এরকম : দলবদ্ধভাবে এবং পালাক্রমে তারা বিভিন্ন ঘরের চাল মেরামত শুরু করবে। প্রথমে বড় বড় কয়েকটি ঘর, যেন বৃষ্টি হলে অন্য গৃহহীনেরা আশ্রয় নিতে পারে। তারপর অন্যান্য ঘর। গ্রামের ছয় শ চাল উড়ে গেছে। কিন্তু জোয়ান লোক আছে এক হাজার। তারা একত্রে কাজ করলে কয়দিন আর লাগবে উঠাতে?

কিছুক্ষণ আগে যারা হাউমাউ কান্না জুড়েছিল তারা পর্যন্ত সানন্দে অগ্রসর হল।

শুরু হল গ্রামে দলবদ্ধভাবে চাল মেরামত। আজ এ-পাড়া, কাল ও-পাড়া।

সবাই কাজের নেশায় মাতল। ছোটখাটো সাহায্যের জন্য অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ভিড় করতে লাগল। তাদের কাছে বাড়ির পর যেন নতুন তামাশার আবির্ভাব ঘটেছে। বিপদের মোকাবিলায় সবার বুকে কত হিম্মত সঞ্চিত ছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

কয়েকদিন পর।

আর মাত্র পাঁচ-ছ'টি ঘরের চাল ওঠানো বাকি। সারাদিন মেহনত শেষে সবাই খাঁ-বাড়ির দহলিজে জমায়েত হয়েছিল। উদ্দেশ্য অবসর উপভোগ, যুক্তি-পরামর্শ, কাজের হিসাব গ্রহণ ইত্যাদি। চারদিকে গোখুলির আবছা অশ্লকার, সম্মুখা আসন্ন। দহলিজে তখনও কেরোসিনের ডিবা জ্বালানো হয়নি। প্রাঙ্গণে একজন আগন্তুক উপস্থিত হলেন। এ মানুষটির অবয়ব শুধু দেখা যায়। সুতরাং চেনা কষ্টকর।



সালাম ইত্যাদির পর আগন্তুকের মুখে প্রথম প্রশ্ন : ‘আরশাদ খাঁ সাহেব কে ?’

– আমি।

আরশাদ খাঁ দাওয়ার ধারে বসেছিলেন, জবাব দিলেন। আগন্তুক খাঁ সাহেবের দিকে অগ্রসর হন। তারপর করমর্দন করতে করতে বলতে থাকেন, ‘আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন।’

– আমি ?

– হ্যাঁ।

ততক্ষণে এক জন ডিবা জ্বালিয়ে এনেছে। সবার মুখে ফিসফিস শব্দ : কো-অপারেটিভ ইলপেট্টর, কো-অপারেটিভ ইলপেট্টর।

সতম্ভিত আরশাদ খাঁ। মনে তার অসোয়াস্টি। তিনি বলেন, ‘আমি সমবায় সমিতি গড়েছি ?’

– হ্যাঁ।

– ক্যামনে ইলপেট্টর সাব ?

চারুপাঠ

- আপনি গড়েছেন। প্রত্যেকের কাজ সবাই মিলে করা এই তো সমবায়। আপনি যে কাজ করলেন এর আমরা কী নাম দিতাম জানেন ?
- কী ?
- সমবায় গৃহ নির্মাণ ও সংস্কার সমিতি।
- সাঁচ কইলেন, হুজুর ?
- হ্যাঁ। ঠিক এরকম সমবায় ফসল বিক্রয় সমিতি, সমবায় ঋণদান সমিতি হতে পারে।

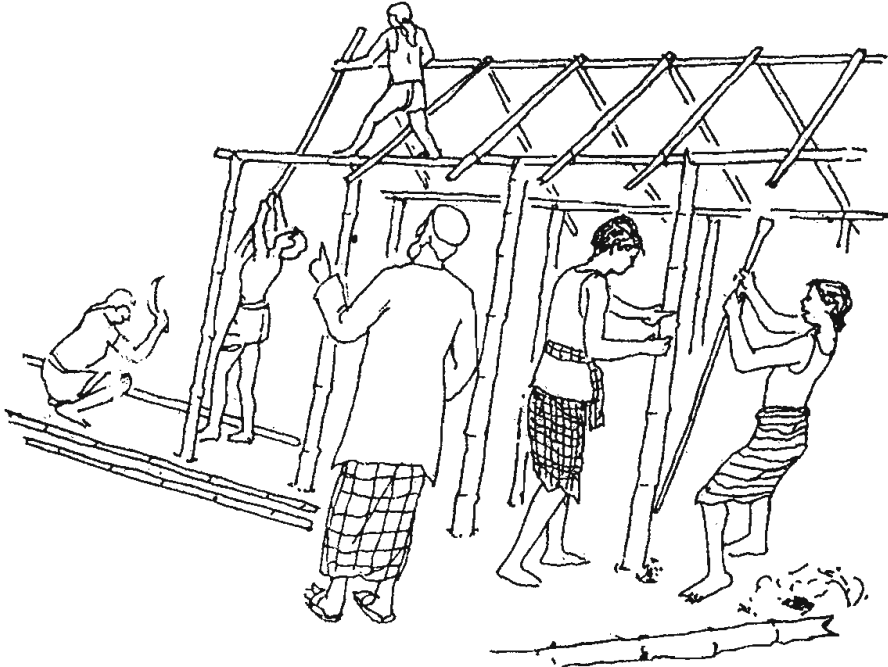
দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে আরশাদ খাঁ বললেন, ‘ত আগে কইলেন না ক্যা ? এই সব ভাঙিরিত (ভ্রাতৃত্ব) মইততিরি (মৈত্রী)—বড় বড় কথা কী আমরা বুঝি ? সেইদিন কী কইছিলেন ?

- সব বুঝবেন। কিন্তু আজ আমি আসি। অনেক দূরে বাসা। আজ এ-পথে আসতে আপনাদের কথা শুনলাম, কাল আসব।
- আইসেন কিন্তু, হুজুর। অহন বুঝতাছি, তুফান খুব ছবক দিয়া গেছে গা।
- নিশ্চয়ই আসব।

আগন্তুক বিদায় নিল। এখানে কিন্তু কলগুঞ্জ আর থামে না। রাত গড়িয়ে যায়।

নানা আলোচনার পর আবার হঠাৎ সতর্কতা আসে। তারই মধ্যে করিম বলল, ‘চাচা। আসমানে মেঘ জমতাছে। ফের যদি তুফান আহে ...’

আইতে দাও। তুফানেরে আর ডরাই না। জবাব দিল আরশাদ খাঁ। কয়েকজন একত্রে চিৎকার দিয়ে উঠল — ‘আল্লুক তুফান ! তুফানেরে আর ডরাই না।’



শব্দার্থ

একসূত্রে	- একত্রে, এক সুতোয়।	ইসরাফিলের শিঙা	- ইসলামধর্ম অনুযায়ী ইসরাফিল ফেরেশতা শিঙা ফুঁকিয়ে আসন্ন কেয়ামতের সংকেত দেবেন।
জনপদ	- লোকালয়, যেখানে একসাথে অনেক লোকের বাস।	দীর্ঘবিদীর্ঘ	- ভেঙে চুরমার।
দহলিজ	- বৈঠকখানা।	কুটিল	- খল, কপট।
কলগুঞ্জন	- অস্পষ্ট শব্দ।	করমর্দন	- হাতে হাতে মেলানো।
স্টিমিত	- ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল।	মূহ্যমান	- কাতর হয়ে পড়া।
ইঙ্গপেট্টর	- পরিদর্শক।	প্রলয়	- কেয়ামত, ধ্বংস, বিনাশ।
বন্ধক	- ঋণের জামিনরূপে কোনোকিছু গচ্ছিত রাখা বা গচ্ছিত জিনিস।	বর্ষীয়ান	- প্রবীণ, বয়সে বড়।
শঙ্কার	- ভয়ের।	মসিবত	- বিপদ।
আশঙ্কা	- কোনো বিপদ ঘটতে পারে এমন চিন্তা।	হিম্মত	- সাহস, শক্তি।
সত্ধ	- নীরব, নিচ্চল।	অবয়ব	- আদল, চেহারা, আকৃতি।
পূর্বাভাস	- কিছু ঘটনার আগে তার ইঙ্গিত।	ডিবা	- বাতি।
উপক্রম	- সূত্রপাত, আরম্ভ, চেষ্টা।	কো-অপারেটিভ	- সমবায়, অনেকে মিলিতভাবে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ।
আক্রোশ	- বিদ্বেষ, ক্রোধ।	স্তুম্ভিত	- বিস্ময়ে স্তম্ভ।
দস্তপাটি	- দাঁতের সারি।	অসোয়াস্টি	- আরামের অভাব, অস্থিতি।
অনড়	- অটল, অপরিবর্তনীয়, যা নড়ানো কঠিন।	শাঁচ	- সত্য।
		ছবক	- শিক্ষা, পাঠ।

পাঠ-পরিচিতি

‘একসূত্রে’ গল্পটিতে কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান ‘সমবায়’ বা সকলে মিলেমিশে কাজ করার উপকারিতার গল্প শুনিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, গ্রামের সাধারণ সহজ সরল মানুষ ‘ভ্রাতৃত্ব’ ‘মৈত্রী’, ‘সমবায় সমিতি’ ইত্যাদি বড় বড় কথা না বুঝলেও তারা সবাই একসাথে কাজ করে অনেক বড় বিপদও মোকাবেলা করতে পারে। লেখক গল্পটির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের উপায়ও বলে দিয়েছেন। এখানে যে গ্রামের কথা বলা হয়েছে তা বাংলাদেশের আর দশটি গ্রামের মতোই। এ গ্রামের বেশির ভাগ লোক দরিদ্র। এরা খড়োঘরে বাস করে। এদের বেশিরভাগ সময় কাটে কাজের মধ্যে। তবে কখনও কখনও একটা কিছু উপলক্ষে তারা গ্রামের মুরুবির দহলিজে জড়ো হয়ে তাদের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। এই গ্রামের ওপর দিয়ে এক রাতে জোর তুফান বয়ে যায়। ঘরগুলো ভেঙে চুরমার হয়। পুরো গ্রাম লুণ্ঠিত হয়ে যায়। খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয় অসহায় মানুষ। সবার চোখে মুখে একটি প্রশ্ন—এখন কী করা যায় ? গ্রামের ষাট বছরের বুড়ো মুরুবি আরশাদ খাঁ সবাইকে বিপদে অধীর না হয়ে ধৈর্য ধরতে এবং দলবদ্ধভাবে ও পালানোকে বিভিন্ন ঘরের চাল মেরামতের পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে ছেলে বুড়ো সবাই লেগে যায় চাল মেরামতের কাজে। এতে তারা উৎসাহ ও আনন্দ পায়। এভাবে পাঁচ ছ টি ছাড়া গ্রামের প্রায় সব ঘর অল্পদিনের মধ্যে মেরামত হয়ে যায়। এ সময়ে সম্প্রদায়ের অস্থিরতায় একদিন সমবায়-পরিদর্শক গ্রামবাসীদের মধ্যে এসে হাজির হন। তিনি মুরুবি আরশাদ খাঁকে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য ধন্যবাদ জানান। আরশাদ খাঁর প্রথমে বুঝতে কষ্ট হলেও পরে পরিদর্শকের কথায় অনুধাবন করেন যে প্রত্যেক কাজ সবাই মিলে করার নামই সমবায়। এরপর আবার যখন ঝড়ের আভাস দেখা দেয় তখন গ্রামের দু-একজন শঙ্কিত হলেও বেশিরভাগ লোকই ভয় পায় না। কারণ তারা জেনে গেছে মিলেমিশে কাজ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগও মোকাবেলা করা যায়।

লেখক-পরিচিতি

সাহিত্যচর্চা শুরু করে যিনি শওকত ওসমান নামে বাংলা সাহিত্যে আসন করে নিয়েছেন তাঁর আসল নাম আজিজুর রহমান।

শওকত ওসমানের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবলসিংহপুর গ্রামে ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারিতে। দীর্ঘদিন তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন। তবে অধ্যাপনা জীবনে প্রবেশ করার আগে তাঁর চাকরিজীবন ছিল বিচিত্র। শওকত ওসমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পুরস্কারগুলো হচ্ছে : ‘আদমজি সাহিত্য পুরস্কার’, ‘বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ‘নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক’, ‘ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার’ ইত্যাদি। ছোটদের জন্য তিনি যেসব গ্রন্থ লিখেছেন সেগুলো হচ্ছে : ‘ওটন সাহেবের বাংলা’, ‘ডিগবাজি’, ‘মসকুইটোফোন’, ‘তারা দুইজন’, ‘ক্ষুদে সোশালিস্ট’ ‘ছোটদের নানা গল্প’, ‘কথা রচনার কথা’ ও ‘পঞ্চসজী’ ইত্যাদি। শওকত ওসমান ১৯৯৮ সালের ১৪ই মে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘একসূত্রে’ গল্পটির লেখক কে ?

ক. শওকত ওসমান

খ. আলী ইমাম

গ. আবু ইসহাক

ঘ. শওকত আলী

নিচের অংশটুকু পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন।’

২. কার উদ্দেশ্যে এ উক্তি করা হয়েছে?

ক. করিমের

খ. আরশাদ খাঁর

গ. ইমপেক্টরের

ঘ. লেখকের

৩. উদ্ভূতির সমবায় সমিতিটি কেমন?

ক. সরকারি সমবায় সমিতি

খ. বেসরকারি সমবায় সমিতি

গ. অনেকে মিলে গৃহনির্মাণ প্রকল্প

ঘ. অনেকে মিলে অবসর বিনোদন প্রকল্প

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৪ – ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘কয়, আপনারা সমবায় সমিতি বানান। ফসলের ভালো দাম পাইবেন, কর্জ পাইবেন। মহাজনের কাছে জমি-জিরাত বন্ধক দেওন লাগবে না। এইসব হাবিজাবি কথা।’

৪. সমবায় সমিতি বানাতে বলেন কে ?

ক. আরশাদ খাঁ

খ. ইমপেক্টর সাহেব

গ. করিম

ঘ. লেখক

৫. সমবায় সমিতির মাধ্যমে ফসলের ভালো দাম পেতে নিচের কোনটি সবচেয়ে বেশি সহায়ক ?
- ক. যৌথভাবে দর-দাম করতে পারে। খ. নিজস্ব গুদামে ফসল রাখতে পারে।
- গ. সদস্যদের মধ্যে ফসল বিক্রি করতে পারে। ঘ. নিজস্ব পরিবহনে ফসল বাজারে নিতে পারে।
৬. সমিতির মাধ্যমে ঋণ পাওয়া সহজ কেন?
- ক. কোনো জামানত লাগে না। খ. ঋণগ্রহীতার উপস্থিতি লাগে না।
- গ. ঋণের জন্য কোনো সুদ দিতে হয় না। ঘ. ঋণ ফেরত দিতে দেরি হলে জরিমানা নেই।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘আইতে দাও। তুফানের আর ডরাই না।’ জবাব দিল আরশাদ খাঁ। কয়েকজন একত্রে চিৎকার দিয়ে উঠল-‘আসুক! তুফানের আর ডরাই না।’

- ক. ‘আইতে দাও’ বলে কিসের কথা বলা হয়েছে ?
- খ. তুফানের আর তারা ডরাই না কেন? -ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্ভূতির মধ্যে বিপদ মোকাবেলা করার যে সমবেত সাহসিকতার পরিচয় আছে তার ফলাফল লিখ।
- ঘ. উদ্দীপকে যে শক্তির কথা বলা হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আর মাত্র পাঁচ-ছ টি খড়ের চাল ওঠানো বাকি। সারাদিন মেহনত শেষে সবাই খাঁ-বাড়ির দহলিজে জমায়েত হয়েছিল। উদ্দেশ্য অবসর উপভোগ, যুক্তি-পরামর্শ, কাজের হিসাব গ্রহণ ইত্যাদি।... প্রাঙ্গণে একজন আগন্তুক উপস্থিত হলেন।

- ক. আগন্তুক কে?
- খ. মেহনত শেষে বলতে কিসের মেহনতের কথা বলা হয়েছে? - বুঝিয়ে লিখ।
- গ. কাজের শেষে অবসর উপভোগ, যুক্তি-পরামর্শ ও কাজের হিসাব গ্রহণ দরকার কেন? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
- ঘ. কোনো মহৎ কাজ শুরুর পূর্বে যুক্তি পরামর্শের আবশ্যিকতা সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

৩. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আরশাদ খাঁ সম্বোধন করে বললেন, ‘ভাইসব মসিবতে কানলে হয় না।’ বৃকে জোর করা লাগে। আমি যা কই শোনো।” সবাই নিমগ্নচিন্তে বৃক্ষের উপদেশ শোনে। সবারই দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ।

সংক্ষেপে তাঁর পরামর্শ এরকম: দলবদ্ধভাবে এবং পালক্রমে তারা বিভিন্ন ঘরের চাল মেরামত শুরু করবে। প্রথমে বড় বড় কয়েকটি ঘর, যেন বৃষ্টি হলে অন্য গৃহহীনেরা আশ্রয় নিতে পারে। তারপর অন্যান্য ঘর। গ্রামের ছয়শ চাল উড়ে গেছে। কিন্তু জোয়ান লোক আছে এক হাজার। তারা একত্রে কাজ করলে কয়দিন লাগবে উঠাতে? কিছুক্ষণ আগে যারা হাউমাউ কান্না জুড়েছিল তারা পর্যন্ত সানন্দে অগ্রসর হল।

- ক. আরশাদ খাঁ কে ?
- খ. ‘মসিবতে কানলে হয় না। বৃকে জোর করা লাগে’-কথাগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্ভূতাংশে আরশাদ খাঁ সবাইকে বাড়ের পরে যে পরামর্শ দেন, তা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? আলোচনা কর।
- ঘ. ‘মিলেমিশে কাজ করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব’-এই উক্তির সত্যতা উদ্ভূতাংশের আলোকে আলোচনা কর।



আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লেগেছে বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য জাদুর ছোঁয়া। তার স্পর্শে রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রার ধরন। এই জাদুর নাম ইলেকট্রনিক্স।

আমাদের রোজকার জীবনে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে ইলেকট্রনিক্স-এর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব।

ইলেকট্রনিক্স-এর কল্যাণে আমরা আজকাল দূরদূরান্তের নানা খবর ও ঘটনা সজ্ঞে সজ্ঞে জানতে পারছি। আজকাল ঘরে ঘরে রয়েছে রেডিও এবং টেলিভিশন। এদের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই গোটা বিশ্বের খবরাখবর শুনি, নানারকম অনুষ্ঠান দেখি। সাম্প্রতিককালে এই ইলেকট্রনিক্স-এর কল্যাণে আমরা ঘরে বসেই সিনেমা দেখতে পাই। তার জন্য আর সিনেমাহলে যাওয়ার দরকার পড়ে না। ভিসিআর-এ ভিডিও টেপ চালিয়ে যে-কোনো সময়ে দেশবিদেশের যে-কোনো বিখ্যাত চলচ্চিত্র ঘরে বসেই দেখে নেয়া যায়। শুধু কি তাই! কোনো কাজে বাইরে থাকায় হয়তো কোনো অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ তোমার হল না; তোমার পরিবারের যে-কেউ বা তোমার কোনো বন্ধু তা তোমার জন্য ভিডিও করে রাখতে পারেন। তুমি পরে সুবিধামতো সময়ে তা দেখে নিতে পার।

আজকাল বিদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে একধরনের বুদ্ধিমান রেডিও যার বাড়তি সুবিধা হল জরুরি খবর, এমনকি আবহাওয়া মানচিত্র ইত্যাদি সজ্ঞে সজ্ঞে ছেপে বের করে দিতে পারে। আর ডিশ অ্যান্টেনার বদৌলতে বিভিন্ন চ্যানেলে ইচ্ছেমতো অনুষ্ঠান দেখা চলে। বিশেষ একটা বাড়তি যন্ত্র লাগিয়ে দিলে টিভির একই পর্দায় কোণায় ইনসেটে আরও একটি অনুষ্ঠানও দেখা যায়। এভাবে এক পর্দায় দুই টিভি দেখা এখন শুরু হচ্ছে।

তোমার বাবা হয়তো বিদেশে গেছেন চাকরি করতে কিংবা বেড়াতে। আগে তাঁর চিঠির জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু এখন ইলেকট্রনিক্স-এর কল্যাণে সরাসরি টেলিফোনে তুমি তার সাথে কথা বলতে পার। চাইলে তিনি অডিও বা ভিডিও ক্যাসেটে তার কথা কিংবা সচল ছবি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আধুনিক টেলিফোন ব্যবস্থায় সাম্প্রতিককালের সংযোজন হল ভিডিও ফোন। তার মাধ্যমে টেলিফোনের মিনিপর্দায় আলাপেরতদের ছবিও ভেসে ওঠে।

ইলেকট্রনিক্স আজকাল কী না দিয়েছে আমাদের! ইলেকট্রনিক্স ঘড়ির সুমধুর ঝংকার ভোরবেলায় তোমার ঘুম ভাঙাতে পারে। সেইসাথে সেদিন কত তারিখ, কী বার তাও জানতে পার। পরীক্ষার হলে সুন্দর মিউজিক বাজিয়ে তোমাকে সময়-সংকেত দেয় ইলেকট্রনিক ঘড়ি। রোগীকে জানিয়ে দেয় তার ওষুধ খাবার সময়।

বাড়িতে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে আজকাল ছোটবড় নানা ক্যালকুলেটর যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের বিরাট বিরাট সব হিসেবনিকেশ মুহূর্তেই করে দিচ্ছে। তাও কিন্তু ইলেকট্রনিক্স-এর দান।

বহুতলা আবাসিক দালানের লিফটে চড়েছ? লিফটটা কোন মুহূর্তে কোন তলায় আছে সেটা জানিয়ে দিচ্ছে ইলেকট্রনিক্স। লিফটের দরজা যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলছে ও বন্ধ হচ্ছে সেটা কে করছে? তাও ইলেকট্রনিক্স। এমনকি পাঁচতলার বাসিন্দা নিচের তলায় দাঁড়িয়ে রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে তার ফ্লাটের লোকজনকে তার আগমন-সংবাদ জানাতে পারেন। সেটাও কিন্তু ইলেকট্রনিক্স-এর বদৌলতে।

ইলেকট্রনিক্স-এর কল্যাণে কোনোকিছু মাপার জন্য এখন আর ফিতে ধরার দরকার পড়ে না। ইলেকট্রনিক্স ফিতের সাহায্যে বোতাম টিপে মুহূর্তেই যন্ত্রের পর্দায় পাওয়া যাচ্ছে দূরত্বের হিসাব।

বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে তৈরি করেছেন এমন ইলেকট্রনিক ক্যামেরা, যার রঙিন ছবি হাতে নিয়ে দেখার দরকার হয় না। এখন বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমেই ধারণ করে রাখা হয় ঐসব মুহূর্তের চলমান চিত্র।

ইলেকট্রনিক্সের কল্যাণে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটেছে। ফোনকার্ড, কর্ডবিহীন ফোনের যুগ পেরিয়ে এখন শুরু হয়েছে মুঠোফোন বা মোবাইল ফোনের যুগ। ছোট মুঠোফোন যে-কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া চলে এবং সেখান থেকে দেশে-বিদেশে সর্বত্র ফোনে কথা বলা যায়। মুঠোফোনের মাধ্যমে এসএমএস করে সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠানো যায়। এছাড়াও ছবি তোলা, গান শোনা সহ অনেক কাজে মুঠোফোন আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে।

ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুগান্তর এনেছে ফ্যাক্স। এর সাহায্যে যে-কোনো ছবি, সংবাদ, নকশা, চিঠি নিমেষে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় পৌঁছে দেয়া যায়।

ইলেকট্রনিক্স-এর সবচেয়ে বড় অবদান ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। বিদেশের স্কুল-কলেজে আজকাল কম্পিউটার হয়েছে শিক্ষার বাহন। আমাদের দেশেও তা আসছে। এসব কম্পিউটার শিক্ষাজগতের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করছে।



কম্পিউটার এখন ইলেকট্রনিক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। এর সাহায্যে রঙিন টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে নানা পাঠ্যবিষয়ের ছবি। অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল সবই শেখা যায় এর সাহায্যে। এমনকি ছবি আঁকিয়ে হিসেবেও কাজ করে কম্পিউটার। যে-কোনো ছবিকে খুশিমতো রং করার যান্ত্রিক তুলিও আছে এতে। প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে বৈজ্ঞানিক নকশা—সবই করা যায় এর সাহায্যে। সেইসাথে আছে নানারকম মজার খেলা।

কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন হয়। কম্পিউটারে একধরনের প্রোগ্রাম থাকে যাকে বলা যায় ইলেকট্রনিক অভিধান বা শব্দকোষ। এতে যে-কোনো শব্দের অর্থ বা প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। এর সাহায্যে কোন শব্দের কী বানান হবে তাও যাচাই করা চলে।

কম্পিউটার এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় কী হবে তা বলে দেয়। এর সাহায্যে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্পেনীয়, আরবি, রুশ ইত্যাদি শব্দের অনুবাদ করা চলে। শুধু শব্দ নয়, বড় বড় বাক্য অনুবাদের কাজও একনিমেয়ে করতে পারে অনুবাদ কম্পিউটার। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বাংলা অনুবাদও করা যাবে কম্পিউটারে।

কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসর প্রোগ্রামের সাহায্যে কোনোকিছু হাতে লেখার বদলে সরাসরি টাইপ করে নেয়া চলে। কম্পিউটারের পর্দায় সজ্জা সজ্জা তা পড়ে নেয়া যায়। ভুলচুক চোখে পড়লে দরকারমতো শুধরে নিয়ে তা সজ্জা সজ্জা ছাপিয়েও নেয়া যায়। আধুনিক ছাপাখানায় এখন আর পুরোনো দিনের সীসার হরফ ব্যবহৃত হয় না। মুদ্রণের ক্ষেত্রে কম্পোজের কাজ এখন কম্পিউটারই করে থাকে।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে দেশ-বিদেশে ঘোরেন, দিনের পর-দিন-রুটিনমাসিক কাজ সারেন, তাদের সাহায্য করে ইলেকট্রনিক ডায়েরি বা ইলেকট্রনিক ম্যানেজার কম্পিউটার। ধরুন কোনো শিল্পপতিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার বিদেশ যেতে হবে, ছ'টা কাজের দিনে উনিশটি মিটিং করতে হবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে পঁচানব্বইটি চিঠি লিখতে হবে, বিভিন্ন খাতে পঞ্চাশটি হিসাবপত্র সারতে হবে, বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময় দশটি সাক্ষাৎকার দিতে হবে। এসব আর তাকে লিখে রাখতে হবে না। কম্পিউটার-স্মৃতি সব ঠিকঠিকমতো সংরক্ষণ করবে এবং কম্পিউটারের বোতাম টিপে প্রয়োজনমতো নির্দেশ দিলে সজ্জা সজ্জা কম্পিউটার তা জানিয়ে দেবে। এমনকি একধরনের ইলেকট্রনিক ক্যালেন্ডারও বের হয়েছে যা বিশেষ বিশেষ তারিখ ও সময় বাতি জ্বলে-নিভিয়ে জানিয়ে দেয়।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যাংকের লেনদেন, রেল, বিমান ইত্যাদির যাবতীয় কাজও ইলেকট্রনিক যন্ত্র, বিশেষ করে কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। দেশে পরীক্ষার ফলাফল তৈরিতেও এখন কম্পিউটারের সাহায্য নেয়া হচ্ছে।

রোগ নিরাময়ে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এনেছে বৈপ্লবিক অগ্রগতি। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শরীরের সব রহস্য চিকিৎসকরা সহজেই ধরতে পারেন। আজকাল অপারেশন না করে বাইরে থেকেই চূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে শরীরের ভেতরকার কিডনি পাথর। হৃৎপিণ্ডের মারাত্মক অসুখে চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে এর কল্যাণে। অপারেশন ছাড়াও কৃত্রিমভাবে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস চালু রাখার কাজটিও করছে ইলেকট্রনিক্স। কয়েক মিনিটে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের চিকিৎসা করছে ‘দাঁতের ডাক্তার কম্পিউটার’। ইলেকট্রনিক কান ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বধির ফিরে পাচ্ছে শ্রুতিক্ষমতা। ‘চোখের ডাক্তার কম্পিউটারে’ ব্যবহৃত হচ্ছে চোখের সূক্ষ্ম সব রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে।

আজকাল অনেক স্রষ্টাক্রিয় খেলনা দেখা যায় যার মূল প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স। এছাড়া ‘ভিডিও গেমস্’ ‘কম্পিউটার গেমস্’ ইত্যাদিও ইলেকট্রনিক্স-এর অবদান। এমনকি আন্তর্জাতিক খেলাধুলার শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিযোগিতার ফলাফল চুলচেরা বিশ্লেষণে যে স্লো-মোশন রিপ্রে করা হয় তাও হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স-এর কল্যাণে। বিশ্বকাপ, এশিয়াড, অলিম্পিক গেমস ইত্যাদি আজ যে আমাদের ড্রয়িংরুমে এসে পৌঁছেছে তা কি ইলেকট্রনিক্স ছাড়া তাবা যায় ?

শব্দার্থ

ক্যালকুলেটর	-	হিসাবযন্ত্র।
প্রত্যক্ষ	-	সরাসরি, স্পষ্ট।
রিমোট কন্ট্রোল	-	দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ।
শ্বাসরুদ্ধকর	-	অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ।
চুলচেরা	-	অতি সূক্ষ্ম, খুব নিখুঁত।
সীসা	-	একধরনের ধাতব পদার্থ।
কম্পোজ	-	ছাপার জন্য হরফ বিন্যাস।
পরোক্ষ	-	সরাসরি নয় এমন, গোঁণ, অপ্রধান।
কম্পিউটার	-	নানা কাজের উপযোগী ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রবিশেষ।
যুগান্তর	-	যুগের পরিবর্তন, এক যুগ থেকে অন্য যুগ।
ক্যাসেট	-	শব্দ ও ছবি ধারণকারী ফিতার রিল ভর্তি বাস্ক।
ফ্যাক্স	-	টেলিফোনযুক্ত ফটোকপি যন্ত্র, যার সাহায্যে দূরদূরান্ত থেকে পাঠানো লিখিত তথ্যের অবিকল অনুলিপি সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।

পাঠ-পরিচিতি

‘ইলেকট্রনিক্স’ শব্দটি নতুন। কিন্তু এখন আর এটি অপরিচিত শব্দ নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে এখন ইলেকট্রনিক্স-এর প্রভাব এতই বিপুল ও সুদূরপ্রসারী যে, বর্তমান যুগকে আমরা বলছি ইলেকট্রনিক্স-এর যুগ। ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি আমাদের জীবনে এনেছে বিপ্লব। এই প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে দিচ্ছে প্রচণ্ড গতি, অফুরন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুল সম্ভাবনা। ইলেকট্রনিক্স বাদ দিয়ে আধুনিক জীবন বলতে গেলে অচল হয়ে যাবে।

প্রযুক্তিগত নিখুঁত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং বড় সবকিছুকে এই প্রযুক্তিগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার ক্ষমতা এই প্রয়োগকে করেছে বহুমুখী। রেডিও, টেলিভিশন, হাতঘড়ি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার, রোবট তো বটেই; মুদ্রণ ও উৎপাদন শিল্পে, চিকিৎসা ও গবেষণায়, সমুদ্রবিজ্ঞান ও মহাকাশ প্রযুক্তি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই ইলেকট্রনিক্স-এর জয়যাত্রা অব্যাহত আছে।

দিন দিন ইলেকট্রনিক্স-এর প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান রচনায় দৈনন্দিন জীবনে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহারের কিছু দিক সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ গ্রন্থ লিখে ইতোমধ্যেই গুণীজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ‘পাঠ্য বইয়ের বানান’ পুস্তকের তিনি অন্যতম সম্পাদক।

মাহবুবুল হক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ এবং গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক অনুবাদগ্রন্থ হচ্ছে ‘মৌমাছি ও মানুষ’। বিদ্যালয়ের সহপাঠ সংকলনসহ তাঁর উল্লেখযোগ্য কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘গল্প কথার আলনা’, ‘গল্পগাথা’, ‘টাইম মেশিন’ (অনুবাদ গ্রন্থ), ‘পাঠ্য বইয়ে বাংলা বানানের নিয়ম’।

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক-এর জন্ম ১৯৪৮ সালে, ফরিদপুরের মধুখালিতে। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- উপস্থিত না-থেকেও কোনো অনুষ্ঠান পুরাপুরি উপভোগ করা যায় কিসের কল্যাণে ?
 ক. ভিডিও
 খ. রেডিও
 গ. টেলিভিশন
 ঘ. ভিসিআর
- জরুরি খবর, এমনকি আবহাওয়া মানচিত্র ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে ছেপে বের করে দিতে পারে-
 i. একধরনের রেডিও
 ii. ভিডিও ক্যামেরা
 iii. ইন্টারনেট

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ - ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিমের পিণ্ডে পাথর হয়েছিল। অপারেশনের কথা জানতে পেরে সে খুব ভয় পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে বিনা অপারেশনে তার পিণ্ডের পাথর অপসারণ করা হয়েছে। চিকিৎসায় বর্তমানে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

- রোগ নিরাময়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, কারণ-
 ক. আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার
 খ. চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি
 গ. কম্পিউটারের ব্যবহার
 ঘ. ঔষধের সহজলভ্যতা
- বিনা অপারেশনে রহিমের পিণ্ডের পাথর অপসারণ সম্ভব হয়েছিল কী কারণে?
 ক. শৈল চিকিৎসার বলে
 খ. ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে পাথর চূর্ণ করে
 গ. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে
 ঘ. এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবনের মাধ্যমে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ।

রহিম একা টেলিভিশন দেখছিল। রিমোট কন্ট্রলের বোতাম চেপে চেপে সে বিভিন্ন চ্যানেল পরিবর্তন করার সময় হঠাৎ দেখল একটি চ্যানেলের সংবাদে চীনে ভূমিকম্প হওয়ার সংবাদ সরাসরি দেখাচ্ছে। সাথে সাথে সে তার বাবা-মাকে ফোনে সংবাদটি জানাল। অতঃপর সে আরও বিস্তারিত জানার জন্য কম্পিউটার চালু করে ইন্টারনেটে প্রবেশ করল।

- টেলিভিশনের রিমোট কী ধরনের সামগ্রী ?
- শিক্ষাক্ষেত্রে টেলিভিশন কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
- রহিমের জীবনে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
- তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ।

জনাব রাশেদ একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে তাকে মাঝেমধ্যেই বিদেশে যেতে হয়। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য তাকে বিভিন্ন মিটিং করতে হয়, চিঠিপত্র লিখতে হয়, হিসাব সংরক্ষণ করতে হয় এবং বিভিন্ন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। এসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য তার একটি ইলেকট্রনিক ডায়রি প্রয়োজন।

- ক. ইলেকট্রনিক ডায়রি কী ?
- খ. ইলেকট্রনিক ডায়রি রাশেদ সাহেবকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে-ব্যাখ্যা কর।
- গ. সাধারণ ডায়রি এবং ইলেকট্রনিক ডায়রীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।
- ঘ. দৈনন্দিন জীবনে ইলেকট্রনিক সামগ্রীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ।

ইলেকট্রনিক্সের সবচেয়ে বড় অবদান ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই তাহের একটি কম্পিউটার ক্রয় করেছে এবং তাতে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়েছে। কম্পিউটার থেকে সে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য পাচ্ছে। কম্পিউটার তাহেরের পড়াশুনায় বেশ সাহায্য করেছে। সাথে সাথে সে কম্পিউটারে মজার খেলাও উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। তাই এটা বিনোদনেরও উপকরণ।

- ক. ইলেকট্রনিক্সের সবচেয়ে বড় অবদান কী ?
- খ. কম্পিউটার ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র বর্ণনা কর।
- গ. কম্পিউটার তাহেরের পড়াশুনার জীবনে কীভাবে সাহায্য করতে পারে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘কম্পিউটার বিনোদনেরও উপকরণ’ –কথাটি বিশ্লেষণ কর।



চরিত্র

আলাওল	নিলামওয়ালা	সেনাপতি	৪র্থ ক্রেতা
আলাওলের পিতা	১ম ক্রেতা	চাকর	উর্দিপরা লোক
কোরেশী মাগন	২য় ক্রেতা	ছাত্র	দর্শকবৃন্দ
নওয়াজেস	৩য় ক্রেতা	তবলাবাদক	সভাসদবৃন্দ

প্রথম দৃশ্য

[নিরাভরণ কামরা। মেঝেয় পাতা ফরাশের ওপর বসে আলাওল তানপুরায় সুর বাঁধছেন। আলাওলের পিতা বাঁ-দিককার দরজা দিয়ে নিঃশব্দে কামরায় ঢুকলেন এবং কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলেন।]

পিতা : আলাওল।

[হকচকিয়ে ওঠায় তানপুরায় সুর কেটে গেল।]

আলাওল : আব্বা!

পিতা : শুধু গান গেয়ে তো হবে না বাবা। সংসারের আর দশটা কাজের দায়িত্বও তোমাকে নিতে হবে।

আলাওল : আমাকে দিয়ে কী কাজ হবে তা-ই তো বুঝে উঠতে পারিনে।

পিতা : বোঝা উচিত। বয়স ত্রিশের কোঠা পেরিয়েছে। এখনও কিছু না বুঝলে চলবে কেন ?

আলাওল : আমাকে কাজ দিন তাহলে।

পিতা : তুমি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার। তলওয়ার চালানোটা ভালো করে আয়ত্ত করতে পারলে মজলিস কুতুবের সেনাবাহিনীতে যে-কোনো মুহুর্তে তুমি চাকরি পেতে পারো, অন্তত আমি যতক্ষণ তাঁর প্রধান অমাত্য।

চারুপাঠ

- আলাওল : কিন্তু সেনাবাহিনীতে কাজ নেওয়া –
- পিতা : সবচেয়ে গৌরবের এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য চাকরি। শক্তি ও বুদ্ধি থাকলে অচিরেই অর্জন করতে পারবে অসীম ক্ষমতা।
- আলাওল : আব্বা, আমার সাধনা সূরের—ক্ষমতার নয়।
- পিতা : আকবর বাদশার চেয়ে বড় সুরসাধক তুমি নও। কত বড় শক্তির সম্মুখীন তুমি। কিন্তু তাতে তাঁর সূরের সাধনা ব্যাহত হয়নি।
- আলাওল : আপনার সঙ্গে তর্ক করব না আব্বা। আসলে সেনাবাহিনীর চাকরি আমাকে আকৃষ্ট করে না। যুদ্ধ—বিগ্রহ, হানাহানি আমার ভাল লাগে না। রাজদরবারে সভা—কবিদের ভিতরে আমার একটা চাকরি হয় না আব্বা ?
- পিতা : রাজদরবারের সভা—কবিরা জ্ঞানীগুণী লোক। তাঁদের মজলিসে তোমার মতো পাঠশালার পড়ুয়াকে চাকরি দেওয়া সহজ নয়। তার চেয়ে সেনাবাহিনীতে তোমার চাকরির বন্দোবস্ত করা আমার পক্ষে সহজ।
- আলাওল : বেশ, আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।
- পিতা : খুব ভালো কথা। [যেতে যেতে ফিরে এসে]
ই্যা শোনো। মজলিস কুতুবের হুকুম হয়েছে অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যে কিছু ভালো ঘোড়া কিনতে হবে। আগামীকাল গড়ের হাটে আমি ঘোড়া কিনতে যাব। তুমি যাবে আমার সঙ্গে।
- আলাওল : জি, আচ্ছা।
- পিতা : আজ সন্ধ্যাবেলাই আমাদের রওনা দিতে হবে। তৈরি থেকে। নদীপথে হার্মাদ ডাকাতদের উৎপাত খুব বেড়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে রাজ—তহবিলের অনেক টাকা থাকবে। যথেষ্ট লোকজন এবং হাতিয়ার নিয়েই আমরা বার হব। তবু সাবধান থাকতে হবে।
- আলাওল : জি, আচ্ছা।
[পিতা বেরিয়ে গেলেন। আলাওল পরম আদরে তানপুরাটা গেলাপে পুরতে থাকল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাহাড়ের ঢালু চত্বরে গোলাম বিক্রির হাট। কৃষ্ণকায় স্বাস্থ্যবান একটি যুবকের নিলাম ডাকা হচ্ছে।]

নিলামওয়ালা : চার মরদের চেয়েও বেশি হিম্মত এ গোলামের। সুরুষ ওঠার আগে থেকে সন্ধ্যা লাগা পর্যন্ত একটানা কাজ করবে। মাটি খুঁড়বে, পানি তুলবে, কাঠ কাটবে। দানা খাবার জন্যে বসবে না, পানি খাবার জন্যে দাঁড়াবে না। আসুন খন্দের, হাজার মোহর এর দাম হওয়া উচিত।

১ম ক্রেতা : পঁচ মোহর।

নিলামওয়ালা : পঁচ মোহর ? ইয়া আল্লাহ! এই নওজোয়ান গোলামের দাম পঁচ মোহর ? [গোলামের একটা কড়ে আঙুল তুলে ধরে] এর এই একটা কড়ে আঙুলই তো রোজ পঁচ মোহরের মেহনত করবে।

২য় ক্রেতা : দশ মোহর।

নিলামওয়ালা : দশ মোহর। হাজার মোহরের গোলাম—দশ মোহর—দশ মোহর—

১ম ক্রেতা : পঁচিশ।

- নিলামওয়ালা : পঁচিশ মোহর। পানির দাম—পঁচিশ—পঁচিশ—চলে যায় হাজার মোহরের গোলাম। [দ্বিতীয় ক্রেতাকে]
 হাঁকুন—হাঁকুন তিরিশ—চল্লিশ—পঞ্চাশ—পাঁচশ। তা না হলে পানির দামে চলে যাবে এই তাগড়া
 গোলাম। পঁচিশ—পঁচিশ মোহর। [চারদিকে চেয়ে] আর কেউ নেই ? পঁচিশ মোহর। পঁচিশ মোহর—
 আউয়াল, পঁচিশ—দো, পঁচিশ—তিন। (ঘণ্টায় ঘা দিল। এ নিলাম শেষ। ক্রেতা টাকা মিটিয়ে সওদা
 নিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় নিলাম ডাকে তোলা হল—একজোড়া সাঁওতাল তরুণ তরুণী।]
- নিলামওয়ালা : আসুন, আবার নিলাম শুরু হল। আসুন একজোড়া হীরে কিনবার খরিদার।
 [ক্রেতাবেশী একজনের (৪র্থ ক্রেতা) সঙ্গে নিলামওয়ালার ইশারা বিনিময় হল।]
- ২য় ক্রেতা : এক শ চল্লিশ মোহর
- ৩য় ক্রেতা : এক শ পঞ্চাশ।
- নিলামওয়ালা : এক শ পঞ্চাশ। কাচের দামে হীরে বিক্রি হচ্ছে।
- ৪র্থ ক্রেতা : দু শ পঞ্চাশ।
 [সবাই একযোগে ওর দিকে তাকালো।]
- ৩য় ক্রেতা : দু শ একান্ন।
- ৪র্থ ক্রেতা : দু শ আশি।
- নিলামওয়ালা : [মুখে খুশির আমেজ] দু শ আশি মোহর। কাচের দামে হীরে। বিনুকের দামে মুক্তো।
 দু শ আশি—
- ৩য় ক্রেতা : দু শ একাশি।
- ৪র্থ ক্রেতা : তিন শ।
- ৩য় ক্রেতা : তিন শ এক।
 [শেষ ডাক দিয়েই ৩য় ক্রেতা শঙ্কিতভাবে ৪র্থ ক্রেতার দিকে বারবার তাকাতে লাগল।]
- নিলামওয়ালা : [প্রবল স্বরে] তিন শ এক – তিন শ এক। তিন শ এক—আউয়াল
 [৩য় ক্রেতা আস্তে আস্তে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চেষ্টা করতেই নিলামওয়ালার অনুচররা তাকে
 ঘিরে ধরে] তিন শ – দো, তিন শ এক – তিন। [ঘণ্টাধ্বনি—সওদা বিক্রি হয়ে গেল।
 মোহর জমা দিয়ে মাল নিয়ে চলে যাও।]
- ৩য় ক্রেতা : আমার সঙ্গে অত মোহর নেই।
- নিলামওয়ালা : কত আছে বার করো।
- ৩য় ক্রেতা : দু শ মোহর আছে।
- নিলামওয়ালা : [ধমক দিয়ে] বার করো।
- ৩য় ক্রেতা : [মোহর বের করে] এই নাও।
- নিলামওয়ালা : [তোড়াসুন্দর মোহর না গুণেই অনুচরের হাতে দিয়ে] যাও, ভাগো উল্লুক। এ বাজারে ধার—বাকিতে
 সওদা হয় না। মিছিমিছি হয়রানি করেছ বলে এ টাকা রাজার তহবিলে জমা করে দেওয়া হল।
- ৩য় ক্রেতা : [চিৎকার করে] আমাকে মাল দিতে হবে এখনি। বাকি টাকা কাল সকালে দিয়ে যাব।
- নিলামওয়ালা : কাল সকালে তিন শ মোহর নিয়ে এসো, মাল পাবে।

চারুপাঠ

- ৩য় ক্রেতা : ওই তোড়ায় দু শ মোহর দিলাম তো! বাকিটা –
- নিলামওয়ালা : সবটাই বাকি। যাও ভাগো।
- ৩য় ক্রেতা : একি ডাকাতি নাকি ?
- নিলামওয়ালা : [অনুচরদের ইজ্জিত করে] ভাগাও বজ্জাতটাকে। সময় নষ্ট হচ্ছে।
[অনুচররা ৩য় ক্রেতাকে টানতে টানতে অন্যদিকে নিয়ে গেল। সাঁওতাল দুটিকে সরিয়ে নিয়ে এরপর আলাওলকে নিয়ে এল নিলাম—ডাকের মধ্যে]
- নিলামওয়ালা : এই নওজোয়ান একজন সেরা ঘোড়সওয়ার। দলবল নিয়ে ডাকাতি করাই এর পেশা। জখমি হয়ে ধরা পড়েছে। আসুন খরিদদার আসুন। জ্বরদস্ত এই ঘোড়সওয়ারের দাম হাঁকুন।
- আলাওল : [চিৎকার করে] সব মিথ্যে কথা। এরাই ডাকাত। হার্মাদ ডাকাতির অনুচর সব। নদীতে নৌকা ডাকাতি করেছে। আমার আব্বাকে খুন করেছে। আমাকে জখম করে নিয়ে এসেছে এই গোলামের হাটে বিক্রির জন্যে। আমি মামী লোকের সন্তান। এরাই ডাকাত! এরাই —
- নিলামওয়ালা : চুপ।
[হাতের উল্টোদিক দিয়ে আলাওলের মুখে আঘাত করে। আর্তনাদ করে ওঠে আলাওল।]
এই বদমাশটাকে যে—কোনো দামে বেচে দেওয়া হবে। কিন্তু ভালো দাম হাঁকুন। সে নেহাত ভালো ঘোড়সওয়ার।
[ভিড়ের ভিতর থেকে বিচিত্র উর্দিপরা একজন লোক এগিয়ে আসে। নিলামওয়ালার কাছে গিয়ে]
- উর্দিপরা লোক : একে আরাকানের রাজার অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য খরিদ করা হল। এর মূল্য রাজ—দফতর থেকে স্থির করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- নিলামওয়ালা : [কৃতার্থভাবে] জি, আচ্ছা জনাব।
[উর্দিপরা ক্রক্ষেপ না করে আলাওলকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]
- নিলামওয়ালা : নিলাম আজকের মতো খতম। আবার কাল সকালে নিলাম হবে। হাজির করা হবে তাগড়া—তাগড়া সওদা, নওজোয়ান গোলাম।
[কোলাহল করতে করতে দর্শক ক্রেতাররা বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করে]

তৃতীয় দৃশ্য

[আলাওলের বাসকক্ষ। আলাওল তানপুরায় সুর বাঁধছেন। সামনে উপবিষ্ট একজন ছাত্র। পেছনে তবলাবাদক। তানপুরাটা ছাত্রের হাতে দিলেন।]

- আলাওল : শেখো, সাধকের নিষ্ঠা নিয়ে শিখতে হবে। যত শিখবে ততই তন্ময় হয়ে যাবে। [চাকরের প্রবেশ]
- চাকর : সেনাপতি এসেছেন। ঘোড়া থেকে নেমে এই দিকেই—
[কথা শেষ না হতেই সেনাপতির প্রবেশ। মুখে বিরক্তির ছাপ। এদিক—ওদিক নজর বুলিয়ে তা আরও বেড়ে গেল]
- আলাওল : [বিস্মিত] বসুন সেনাপতি।

সেনাপতি : [বক্তার দিকে না তাকিয়ে] বসতে আসিনি।

[কামরার এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে আলাওলের মুখোমুখি হয়ে]

কথাটা জরুরি বলে আপনার বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছে। এখানে এসে দেখলাম যা শুনছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আলাওল : [শঙ্কিত] কোনো অপরাধ করেছি কি সেনাপতি ?

সেনাপতি : রোসাজোর সেনাদলে আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট গাফিলতি করেছেন। আপনি প্রায়ই কুচকাওয়াজে যোগ দিচ্ছেন না। তার বদলে দেখছি নিজের বাসায় গানের মাহফিল বসিয়েছেন।

আলাওল : গান কি খারাপ ?

সেনাপতি : সে কথা হচ্ছে না। আপনি গুলী বলে আপনাকে আলাদা খাতির দেখানো হয়েছে। তা না হলে আপনি তো সাধারণ সেপাই। আর বেয়াড়া সেপাইদের চাবুক মেরেই শায়েস্তা করা হয়ে থাকে। মনে রাখবেন, আপনাকে এখন থেকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে। শুধু ছুটির দিন ছাড়া বাকি সময় সরকারের।

আলাওল : সেনাপতি, দয়া করে আমাকে ও-কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিন।

সেনাপতি : হার্মাদ ডাকাতদের কাছ থেকে আপনাকে যঁারা কিনে নিয়েছেন, তাঁদের পছন্দ আপনার পছন্দের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। এ সোজা কথাটা বোঝার বয়স আপনার হয়েছে।

আলাওল : তাহলে কাজে গাফিলতির অজুহাতে অভিযুক্ত করে আমাকে রাজদরবারে পাঠিয়ে দিন।

আমি নিজেই মহারাজের কাছে ...

[রাজ-অমাত্য নওয়াজেশের প্রবেশ]

নওয়াজেশ : মহারাজের আদেশ পাওয়া গেছে কবি।

আলাওল : কী আদেশ নওয়াজেশ ?

নওয়াজেশ : প্রধান উজির কোরায়শী মাগন তোমার কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজেই মহারাজের হুকুম নিয়েছেন। তুমি সেনাবাহিনী থেকে মুক্ত।

আলাওল : কী সৌভাগ্য আমার! [হতবুদ্ধি] কী বলব ভেবে পাচ্ছি। [হঠাৎ সেনাপতির দিকে নজর পড়ায় তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে] আমাকে মাফ করবেন সেনাপতি।

সেনাপতি : [অপ্রসন্নতার ভাব তখনও কাটেনি] এখন তো আপনি আমার এখতিয়ারের বাইরে। খোদা আপনার মজাল করুন।

নওয়াজেশ : সত্যিই তুমি ভাগ্যবান কবি। কোরেশী মাগন তোমার কবিতা শুনে বললেন, তোমার জায়গা যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, রাজদরবারে—জ্ঞানী-গুলী সভাকবিদের ভেতরে।

আলাওল : আকস্মিক সৌভাগ্যে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব নওয়াজেশ ভেবে পাচ্ছি।

নওয়াজেশ : মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। আজ থেকে ‘রাজ আসোয়ার’ আলাওল ‘কবি আলাওল’ নামে আরাকানের সুধীসমাজে পরিচিত হবে। নিত্যনতুন কাব্যরসে তুমি আমাদের আনন্দ দেবে। গুলীর কাছ থেকে গুণগ্রাহী এর চেয়ে বড় ধন্যবাদ আশা করে না।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[কোরাযশী মাগনের দরবার। সভাসদরা আলাপরত। একদিকে আলাওল ও নওয়াজেশ উপবিষ্ট।]

মাগন : আজ থেকে এ সভা অলংকৃত করবেন একজন নতুন গুণী—কবি আলাওল। তাঁর নিজের মুখ থেকেই আমরা তাঁর কথা শুনব।

আলাওল : (মাথা ঝুঁকিয়ে) নিজ গুণে কোরাযশীজি আমাকে কৃপা করেছেন। তা না হলে আমার যোগ্যতা কোথায় ? [দ্বিধার সঙ্গে] আমি দীনহীন। আমার পরিচয় তাই তুচ্ছ। তবু কোরাযশীজির আদেশ আমাকে মান্য করতে হবে। আপনারা জ্ঞানী-গুণী। ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করবেন। [সুর করে কাব্যপাঠ আরম্ভ]

আমি পরদেশী এক আলাওল হীন।
রোসাজ্ঞে পড়িぬ আসি নিজের কুদিন ॥
গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ।
অতি পুণ্যবস্ত স্থান নাই পাপলেশ ॥

সভাসদ : সাবাস! সাবাস!

আলাওল : মজলিশ কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর।
তাহার অমাত্যসুত আমি সে পামর ॥

সভাসদ : চমৎকার। চমৎকার।

আলাওল : দৈবচক্রে কার্যহেতু যাইতে নৌকাপথে।
দরশন হইল দস্যু হার্মাদের সাথে ॥
শহীদ হইল পিতা যুঝি বহুতর।
জখম হইয়া আইনু রোসাজ্ঞ শহর ॥

মাগন : তারপর ? কী হল কবি ?

আলাওল : নিজ দুঃখ কতক कहিনু বিরচিয়া।
রাজ আসোয়ার হইনু এখানে আসিয়া ॥
ভাগ্যবলে দুঃখ নাশ করিতে কারণ।
ঠাকুর মাগন সঙ্গে হৈল দরশন ॥

সভাসদ : সাবাস! সাবাস!!

আলাওল : সুন্দর পাগড়ি রাজার মস্তকে শোভিত
কাল মেঘ চিরে যেন চন্দ্রমা উদিত ॥
প্রভুর সুন্দর রূপ कहিতে অনন্ত।
তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবস্ত ॥
গুণের সাগর সাঁতারিলে নাই কূল।
আমি হীন বুদ্ধি, তাঁর মহিমা বহুল ॥

সভাসদ : বহুত আচ্ছা। বহুত আচ্ছা। [করতালি]

মাগন : [কিছুটা বিব্রত] আজ প্রথম দিন। কবিকে তাই তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়া যাক।

সভাসদগণ : তা ঠিক। কিন্তু কবির আসর ছেড়ে যে উঠাই মুশকিল।

মাগন : চলো কবি অন্তরমহলে। দরবারের মতো আমার অন্তঃপুরের দরজাও আজ থেকে তোমার জন্যে অব্যাহত।
[আলাওলকে সঙ্গে নিয়ে মাগন বাঁ দিক দিয়ে এবং অন্য সকলে ডানদিক দিয়ে প্রস্থান করবে।]

[সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত]

শব্দার্থ ও টীকা

গৌড়	-	অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন একটি জনপদ।	হার্মাদ	-	পর্তুগিজ জলদস্যু।
নিরাভরণ	-	(নিঃ+আভরণ) সাজসজ্জাহীন।	হিম্মত	-	সাহস, শক্তি।
আসোয়ার	-	ঘোড়সওয়ার, অশ্বারোহী সেনা।	বিরচিয়া	-	রচনা করে।
রাজ-আসোয়ার	-	রাজার অশ্বারোহী বাহিনীর সেনা।	চন্দ্রমা	-	চাঁদ।
কার্যহেতু	-	কাজের জন্য, কাজের উদ্দেশ্যে।	আওয়াল	-	প্রথম, এক নম্বর।
হকচকিয়ে	-	হঠাৎ চমকে, হতচকিত হয়ে।	সভাকবি	-	রাজসভার নিযুক্ত কবি।
এখতিয়ার	-	অধিকার, আওতা, ক্ষমতা।	অমাত্যসূত	-	মন্ত্রীর পুত্র।
মাহফিল	-	আসর, সভাসমাবেশ, অনুষ্ঠান।	মসলিস	-	আসর, সভা, বৈঠক।
নওজোয়ান	-	যুবক, নবীন যুবক।	তাগড়া	-	বলিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া।
জবরদস্ত	-	দুর্দান্ত, অত্যন্ত বলবান।	যুঝি	-	যুদ্ধ করে।
ভূক্ষেপ	-	দৃষ্টিপাত, মনোযোগ।	বিধি	-	বিধাতা, ভাগ্যনিয়ন্তা।
তন্ময়	-	একান্তভাবে নিমগ্ন, নিবিষ্ট।	গুণবস্ত	-	গুণবিশিষ্ট, গুণযুক্ত।
দৈবচক্রে	-	অপ্রত্যাশিত ঘটনায়, দুর্ভাগ্যক্রমে।			
পুণ্যবস্ত	-	অনেক পুণ্য কাজ করেছেন এমন, গুণযুক্ত ব্যক্তি।			
মরদ	-	পুরুষ, পুরুষোচিত সাহসী ও শক্তিশালী লোক।			
ফরাশ	-	মেঝেতে ঢালাওভাবে বিছানোর বড় চাদর বা আস্তরণ।			
মজলিস কুতুব	-	গজ্ঞা বিধৌত সমভূমি ফতেহাবাদ পরগণার শাসনকর্তা।			
উর্দি	-	সেনাবাহিনীর সদস্য বা রাজকর্মচারীর দায়িত্ব পালনকালীন নির্ধারিত পোশাক।			
পামর	-	পাপী, অধম। (এখানে সৌজন্যবশত আলাওল নিজেকে সামান্য ও নগণ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন।)			
রোসাজা	-	সেকালে আরাকানের রাজধানী ছিল শ্রোহং। চট্টগ্রামবাসীর কণ্ঠে এর উচ্চারণ হয় রোহাং বা রোয়াং। এরই লেখ্য রূপ রোসাজা।			

পাঠ-পরিচিতি

আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় কাব্যপ্রতিভা। সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ শিল্পী। অধিকাংশ পন্ডিতির মতে, তাঁর জন্ম ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগণা (মতান্তরে চট্টগ্রামের মোহরা গ্রাম)। তাঁর পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য।

জলপথে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় যুবক আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগিজ জলদস্যুদের হামলার কবলে পড়েন। ঘটনাস্থলে পিতা নিহত হন। আলাওল কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে আরাকানে উপস্থিত হন। সেখানে আরাকান রাজার অশ্বারোহী পদে চাকরি পান। আরাকান রাজদরবারের প্রতাপশালী অমাত্য কোরেশী মাগনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আলাওলের জীবনের পরিবর্তন ঘটে। আলাওলের কবিপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে কাব্যরচনায় উৎসাহ দেন।

আলাওল বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে তাঁর আত্মবিবরণ লিখে রেখে গেছেন। এর ভিত্তিতে এবং কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্র সন্নিবেশ করে সিকান্দার আবু জাফর ‘মহাকবি আলাওল’ নামে একটি জীবনী নাটক রচনা করেন। ঐ নাটকের প্রথম দিককার কিছু নির্বাচিত অংশকে সর্গস্ফীত ও পরিমার্জিত করে এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

এদেশের সাহিত্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও সাহিত্য সংগঠক সিকান্দার আবু জাফর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, গীতিকার, নাট্যকার, গল্পকার ও সাংবাদিক।

সিকান্দার আবু জাফরের জন্ম খুলনার তেতুলিয়া গ্রামে ১৯১৯ সালে। কর্মজীবনে তিনি প্রধানত সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার ‘দৈনিক নবযুগ’ পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। পরে ‘দৈনিক ইন্ডেফাক’-এর সহযোগী সম্পাদক ও ‘দৈনিক মিল্লাত’-এর প্রধান সম্পাদক হন।

‘সমকাল’ নামে একটি প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিকের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত এর সম্পাদনা তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় দিক। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত “আমাদের সংগ্রাম চলবেই” গানটি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছিল।

তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ৩টি উপন্যাস, ৭টি কাব্যগ্রন্থ ও ২টি নাটক। তাঁর রচনাবলির মধ্যে কয়েকটি পাঠ্যবই ও বেশকিছু অনুবাদগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে কিশোর উপন্যাস ‘জয়ের পথে’ ও জীবনীগ্রন্থ ‘নবী কাহিনী’। এছাড়াও ছোটদের জন্য তাঁর বেশকিছু লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সিকান্দার আবু জাফর ১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দৈবচক্রে কার্য হেতু যাইতে নৌকাপথে ॥

দরশন হইল দস্যু হার্মাদের সাথে”

শহীদ হইল পিতা যুঝি বহুতর।

জখম হইয়া আইনু রোসাজা শহর ॥

১. চরণসমূহের রচয়িতা কে?

ক. সিকান্দার আবু জাফর

গ. কোরায়শী মাগন

খ. কবি আলাওল

ঘ. নওয়াজেশ

২. উদ্ভূতাংশে ‘দরশন হইল’ শব্দের প্রকৃত অর্থ—

ক. দেখা হল

গ. যুদ্ধ হল

খ. দয়া হল

ঘ. শক্তিকত হল

৩. কাব্যংশটির রচনাকাল—

ক. প্রাচীন যুগ

গ. আধুনিক যুগ

খ. মধ্যযুগ

ঘ. যুগ-সম্বিক্ষণ

৪. আলাওলের রোসাজা শহরে আসার কারণ হল—

i. দৈবচক্র

ii. হার্মাদের আক্রমণ

iii. পিতার মৃত্যু

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় কাব্যপ্রতিভা আলাওল। সংগীতজ্ঞ হিসেবেও তিনি ছিলেন এক অসাধারণ শিল্পী। শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার হিসেবে তিনি দক্ষতা অর্জন করলেও এই দক্ষতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে তিনি একেবারেই নির্লিপ্ত ছিলেন। আরাকান রাজদরবারের প্রতাপশালী আমাত্য কোরায়শী মাগনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আলাওলের জীবনে পরিবর্তন ঘটে। রাজদরবারের জ্ঞানীগুণীদের সভায় আলাওলের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়।

ক. অমাত্য শব্দের অর্থ কী ?

খ. আলাওল ঘোড়সওয়ারের দক্ষতাকে পেশা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি কেন ?

গ. রাজদরবারে আলাওল কীভাবে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. ‘আলাওলের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে অমাত্য কোরায়শী মাগনের ভূমিকা অনেক বড়’ –উদ্ভূতাত্ত্বের ওপর তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নিলামওয়ালা : চার মরদের চেয়েও বেশি হিম্মত এ গোলামের। সুবুয় ওঠার আগে থেকে সন্ধ্যা লাগা পর্যন্ত একটানা কাজ করবে। মাটি খুঁড়বে, পানি তুলবে, কাঠ কাটবে। দানা খাবার জন্যে বসবে না, পানি খাবার জন্যে দাঁড়াবে না। আসুন খন্দের, হাজার মোহর এর দাম হওয়া উচিত।

১ম ক্রেতা : পাঁচ মোহর।

নিলাম ওয়ালা : পাঁচ মোহর? ইয়া আল্লাহ! এই নওজোয়ান গোলামের দাম পাঁচ মোহর? [গোলামের একটা কড়ে আঙুল তুলে ধরে] এর এই একটা কড়ে আঙুলই তো রোজ পাঁচ মোহরের মেহনত করবে।

ক. নিলামওয়ালা কে ?

খ. গোলামের দাম হাজার মোহর ধার্য করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটিতে উল্লিখিত কোন কোন বিষয় মানুষের অধিকারকে কমিয়ে দেয় বলে তোমার মনে হয় ?

ঘ. ‘এর এই একটা কড়ে আঙুলই তো পাঁচ মোহরের মেহনত করবে’ –নিলামওয়ালার এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

গল্প বা রূপকথায় কেউ-না-কেউ বর্ণনা করে। কিন্তু নাটকে তেমন কোন কথক বা বর্ণনাকারী থাকে না। থাকে বিভিন্ন চরিত্র। ‘মহাকবি আলাওল’ নাট্যাংশের শুরুতেই দেখা যায় এই নাটকের চরিত্রগুলোর পরিচয় বা তালিকা দেওয়া হয়েছে। চরিত্রের কথোপকথনের ভিতর দিয়েই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠে। নাটকের চরিত্রের এই কথোপকথনকে বলা হয় সংলাপ। সংলাপ নাটকের প্রধান বাহন। সংলাপের মাধ্যমেই আমরা অতীত ঘটনা জানতে পারি এবং পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হই। তাছাড়া সংলাপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় চরিত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

ক. ‘মহাকবি আলাওল’ নাট্যাংশটির লেখক কে ?

খ. নাটকের সংলাপ বলতে কী বোঝায় ?

গ. ‘চরিত্রের কথোপকথনের ভিতর দিয়েই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠে।’ ‘মহাকবি আলাওল’ নাট্যাংশের ক্ষেত্রে একথাটি কতটুকু সঠিক ?

ঘ. ‘সংলাপ নাটকের প্রধান বাহন’ –উক্তিটি অনুচ্ছেদটির আলোকে বিশ্লেষণ কর।



পাখিদের নিয়ে আলী ইমাম

আঁকাবঁকা পাহাড়ি রাস্তা। এ-পাহাড় ও-পাহাড় ছুঁয়ে, সাপের মতো জড়িয়ে ঝনিয়ামুখী শহর পর্যন্ত চলে গিয়েছে এ রাস্তা। আমাদের জিপটা সাঁ সাঁ করে চলছিল। মেজদা চালাচ্ছেন। আমরা যাচ্ছি ঝনিয়ামুখীতে। ওখানে মেলা হচ্ছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় আদিবাসীদের পাহাড়ি নাচ হবার কথা। দুপাশে ঘন জঙ্গল। হঠাৎ করে ছোটবোন টুকু বলল, ‘দেখ ভাইয়া, একটা লোক কী যেন করছে।’

ওর কথা শুনে সামনে তাকিয়ে দেখি, একটা মাঝবয়সী লোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়িটা থামাবার জন্যে হাত তুলে ইশারা করছে।

মেজদা বিরক্ত মুখে বললেন, ‘ধুস্তোরি, এ আবার কে?’ গাড়িটা থামতেই সেই লোকটা ছুটে এল। তালিমারা ময়লা লম্বা একটা কোট গায়ে। মাথায় পুরোনো রথটা একটা হ্যাট, মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কিন্তু লোকটার চোখদুটো ভীষণ মায়াবী। টলটলে। যেন এফুনি কেঁদে ফেলবে, এমন একটা ভাব। ছুটে এসে, কেমন করুণ গলায় বলল, ‘আপনাদের কাছে স্যার রক্ত বন্ধ করার কোনো ওষুধ আছে?’

রীতিমতো অবাক হবার পালা। মেজদা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেন কী দরকার?’

‘স্যার, একটা খরগোশ, মানে একটা খরগোশ খুব আঘাত পেয়েছে। খুব রক্ত পড়ছে ওটার পা থেকে। আমি খরগোশটাকে ওখানে রেখে এসেছি স্যার। ওষুধ লাগাতে পারলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম।’

আমরা সবাই অবাক হয়ে লোকটার কথা শুনছিলাম।

পাগল নয়তো আবার! মেজদা বললেন, ‘দেখুন আমাদের কাছে তো ও-ধরনের কোনো ওষুধ নেই।’

লোকটা একটু মিইয়ে গিয়ে বললেন, ‘ও! তা স্যার আপনাদের বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। দেখি কোনো ঘাসের রস লাগিয়ে খরগোশটার রক্তপড়া বন্ধ করতে পারি কি না।’ – বলে লোকটা ত্রস্তপদে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল।

মেজদা আবার জিপ চালাতে লাগলেন। দূরে আবছা কুয়াশার মতো চোখে পড়ছে বনিয়ামুখী শহর। রেস্টহাউসে উঠলাম আমরা। দূরে দূরে সরল গাছের সারি। বাতাসে সে গাছের শূকনো পাতা ঝরে রেস্টহাউসের সামনের লাল কাঁকর ছাওয়া একচিলতে পথটাকে ভরে রেখেছে। সবাই মেলা দেখতে চলে গেল।

আমি একলা বনিয়ামুখী শহরটা ঘুরে দেখবার জন্য বের হলাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি সেই লোকটা বাস থেকে নামছে। হাতে দুটো বড় বড় ঝাঁচা। নানা রকমের পাখি ভর্তি তাতে। কিছু অবাক হয়ে দেখলাম কোনো পাখির ডানা ভাঙা, কোনোটার পা দুমড়ে গেছে। কাল রাতে ভীষণ ঝড় হয়েছিল। বুঝলাম পাখিগুলোর এমন দশা সেই ঝড়ের জন্যই হয়েছে। কিন্তু ঐ আজগুবি লোকটা এসব পাখি নিয়ে কী করছে? কৌতূহলী হয়ে তার পেছনে চলা শুরু করলাম। একজন লোক তাকে দেখে চোঁচিয়ে বলল, ‘এই যে ঝগড়ু, এইসব মরা পাখিগুলো জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে এনেছ নাকি?’



ঝগড়ু নামের সেই লোকটা মাথার রংচটা হ্যাটটাকে খুলে বলল, ‘মরা পাখি মানে! সবগুলো বেঁচে আছে। দেখেছ, ঝড়ের জন্য সারারাত কী কষ্টে ছিল ওরা। আহা, এই হলুদ পাখিটার একটা ঠ্যাং বুঝি ভেঙেই গেছে।’

‘তা যাচ্ছ কোথায় এসব নিয়ে?’

‘ঐ যে মথলি বুড়ির কাছে যাচ্ছি। বুড়ি পাহাড়ি লতা হেঁচে ভারি অদ্ভুত একটা ওষুধ বানাতে পারে। ঐ ওষুধ লাগালেই পাখিগুলো একদম সেরে যাবে। আবার এই পাখিগুলো আকাশে উড়বে।’

বলতে বলতে লোকটার চোখদুটো চকচকিয়ে উঠল। আমার মনে হল, লোকটা আকাশ দেখছে। অপরাজিতার মতো নীল আকাশ।

চারুপাঠ

সে আকাশে অনেক পাখি ডানায় রোদ মেখে উড়ছে। সোনার কুটির মতো উড়ছে।

পাখিদের বুঝি বড্ড ভালোবাসে লোকটা। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই যে ঝগড়ু মিয়া, আপনার খরগোশটার রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে তো?’

লোকটা অবাক হয়ে বলল, ‘তা স্যার আপনি কী করে জানলেন? ও, আপনি বুঝি সেই জিপটায় ছিলেন। সেরেছে স্যার, বেচারার খুব কষ্ট হচ্ছিল। জানেন, পশুপাখিদের দুঃখ আমি আবার একেবারে সহ্য করতে পারি না। ওরা তো ওদের কোনো কষ্টের কথা আমাদের বলতে পারে না।’

‘আপনার মায়া লাগে?’

‘লাগবে না মানে। হাজারবার লাগে স্যার। কিন্তু কী আর বলব, মানুষের দিলও আজকাল ওদের জন্য গলে না।’

কাকের ডানার মতো সন্ধ্যা নেমেছে তখন ঝনিয়ামুখীতে। সরল গাছের বুক ছুঁয়ে সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে। আমি ঝগড়ু নামের সেই লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না অন্ধকারে। শুধু তার বিষাদভরা কণ্ঠ কানে আসছিল। ‘আমি স্যার, ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জঙ্গল আমাকে পাগলের মতো টানে। আমার কেউ নেই স্যার এই পৃথিবীতে। শুধু এই পশু-পাখিরা রয়েছে। আমি দেখি কোন কোন পাখি কষ্ট পাচ্ছে। ওদের কষ্টে আমার খুব কষ্ট হয়। যখন পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, তখন ভারি আনন্দ হয় আমার। যাই স্যার। দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

নিরিবিলা রাস্তাটা দিয়ে সামনের দিকে চলে গেল সে। হাতে খাঁচাভর্তি আহত পাখিদের নিয়ে। সে অন্ধকার অরণ্যে পড়ে থাকা পাখি দেখতে চায় না। নীল আকাশে, ঝকঝকে রোদে, উজ্জ্বল আলোর বন্যায় হারিয়ে যাওয়া পাখিদের দেখতে ভালোবাসে।

দিন কয়েক পর খবরের কাগজে পড়লাম, পাহাড়ের ঢল নেমে আসাতে ঝনিয়ামুখীর জঙ্গলে পানি জমেছে। অনেক গাছ তলিয়ে গেছে। আমি ঢাকায় বসে যেন দেখতে পেলাম সেই একহাঁটু পানির ভেতরে ছপছপ শব্দ তুলে মধ্যবয়েসী একটি লোক টলটলে চোখ মেলে, শতচ্ছিন্ন কোটটা তুলে পাখিদের কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা দেখছে। আমার মনে হল, লোকটা এখনও রোদের স্বপ্ন দেখে। রোদের মাঝে উড়ে যাওয়া পাখিদের স্বপ্ন দেখে।

[সামান্য পরিমার্জিত]

শব্দার্থ

দ্রুতপদে	–	ভীত পদক্ষেপে, ভীত পায়ে।
অপরাজিতা	–	একরকম ফুল।
আতঙ্কিত	–	ভীত, যে ভয় পেয়েছে।
বিষাদভরা	–	দুঃখ ভরা।
কুটি	–	খুব ছোট ছোট টুকরো, কুচো।
কাঁকর	–	নুড়ি পাথর।
চিলতে	–	লম্বা ফালি।

পাঠ-পরিচিতি

আমরা ঘরবাড়ি ও চাষাবাদের জন্য যে শুধু বনবনানী সাফ করে চলেছি তা নয়, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের কাঠ পাওয়ার জন্যও বন উজাড় করছি। এর ফলে বনের পশুপাখির সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। তাছাড়া রাসায়নিক বর্জ্য ও কীটনাশক পদার্থ মাটি ও পানি বিষাক্ত করায় এবং নির্বিচারে শিকারের ফলে অনেক পাখি ক্রমেই দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এর ফলে পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং তা শেষপর্যন্ত মানুষের জন্যই ভয়াবহ রকম বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে আজ পশুপাখি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আলী ইমামের ‘পাখিদের নিয়ে’ রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে পশুপাখিদের জন্য একজন মানুষের মমতা। ঝগড়ু মিয়া আহত খরগোশকে বাঁচাতে ওষুধ খোঁজে। ঝড়ে আহত পাখিদের বাঁচাবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে, যেন আবার তারা আকাশে পাখা মেলাতে পারে। পশুপাখির কষ্টে সে কষ্ট পায়। পশুপাখি যখন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে তখন ভারি আনন্দ হয় তার। পশুপাখিদের জন্য ঝগড়ু নামের সেই লোকটার যে মমতা সেই মমতাকে আমাদেরও থাকা দরকার।

লেখক-পরিচিতি

আলী ইমাম বাংলাদেশের সুপরিচিত শিশু-সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বর। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের নির্বাহী প্রযোজক ছিলেন। শিশুদের জন্য তিনি প্রচুর গল্প ও শিশুতোষ রচনা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘দ্বীপের নাম মধুমুনিয়া’, ‘অপারেশন কাঁকনপুর’, ‘চারজনে’, ‘তিতিরমুখী’, ‘চৈতা’, ‘সাদা পরী’, ‘পাখিদের নিয়ে’, ‘রূপোলী ফিতে’, ‘সোনার তসতুরী’, ‘নীল ডুখরির আতঙ্ক’, ‘প্রবাল দ্বীপের আতঙ্ক’, ‘বিদেশী কিশোর গল্প’, ‘কাছ থেকে দূরে’, ইত্যাদি। বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি ছোটদের জন্য যে দুটো বই লিখেছেন তা হল : ‘বাংলা নামে দেশ’ ও ‘জীবন বাংলাদেশ মরণ বাংলাদেশ’।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘ঝনিয়ামুখী’ কী ?
 ক. গ্রাম
 গ. বাড়ি
 খ. শহর
 ঘ. জঙ্গল
২. ঝগড়ু কেমন চরিত্রের লোক ?
 ক. কঠিন মনের
 গ. দরদী মনের
 খ. সহজ মনের
 ঘ. আবেগপ্রবণ
৩. ‘ত্ৰস্তপদে’ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?
 ক. ভীত পদক্ষেপ
 গ. দ্রুত পদে
 খ. ধীর পদে
 ঘ. চঞ্চল পদে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের ঘরবাড়ি, চাষাবাদ, জ্বালানি ইত্যাদির জন্য বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। আর সেজন্যই পশুপাখির সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এছাড়া শিল্প, কল-কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ও কীটনাশক ইত্যাদি মাটি, পানি বা পরিবেশকে বিষাক্ত করায় পশুপাখি ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ও বিলুপ্ত হচ্ছে। তাই পশুপাখি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- ক. আমাদের দেশে বন উজাড় হওয়ার প্রধান কারণ কোনটি? কী কারণে বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে?
- খ. বন উজাড় হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে? অনুচ্ছেদের আলোকে লিখ।
- গ. উপরের অনুচ্ছেদে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিন দিন পশুপাখি বিলুপ্ত হচ্ছে। তাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের কী ধরনের উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে তুমি মনে কর।
- ঘ. পশুপাখি সংরক্ষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পাখিদের নিয়ে রচনাটিতে পশুপাখিদের জন্য ঝগড়ু মিয়ার মমতা যে কত গভীর তা দেখা যায়। সে আহত খরগোশকে বাঁচাতে ওষুধ খোঁজে। ঝড়ে আহত পাখিদের বাঁচাবার জন্য আশ্রাণ চেষ্টা করে। পশুপাখিদের কষ্টে সে কষ্ট পায়। পশুপাখির স্বচ্ছন্দে বিচরণ দেখে ঝগড়ুর ভারি আনন্দ হয়।

- ক. ‘পাখিদের নিয়ে’ রচনাটির লেখক কে?
- খ. ‘পশুপাখির কষ্টে সে কষ্ট পায়’-ঝগড়ু সম্পর্কে মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনুচ্ছেদটুকু পড়ে পশুপাখি সম্পর্কে তোমার অনুভূতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পশুপাখির স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখে ঝগড়ুমিয়ার আনন্দের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৩. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কাকের ডানার মতো সন্ধ্যা নেমেছে তখন ঝনিয়ামুখীতে। সরল গাছের বুক ছুঁয়ে সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে। আমি ঝগড়ু নামের সেই লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না অন্ধকারে। শুধু বিষাদভরা কণ্ঠ কানে আসছিল। ‘আমি স্যার, ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জঙ্গল আমাকে পাগলের মতো টানে। আমার কেউ নেই স্যার এই পৃথিবীতে। শুধু এই পশুপাখিরা রয়েছে। আমি দেখি কোন কোন পাখি কষ্ট পাচ্ছে। ওদের কষ্টে আমার কষ্ট হয়। যখন পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, তখন ভারি আনন্দ হয় আমার। যাই স্যার। দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

- ক. ‘পাখিদের নিয়ে’ রচনাটি কে লিখেছেন?
- খ. ‘কাকের ডানার মতো সন্ধ্যা নেমেছে’ বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?
- গ. অনুচ্ছেদের ঝগড়ু মিয়ার বক্তব্যটি আমাদেরকে পশুপাখিদের প্রতি মমতা দেখাতে কীভাবে অনুপ্রাণিত করবে? -ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘ওদের কষ্টে আমার কষ্ট হয়’ ঝগড়ু মিয়ার এ কষ্টের কারণ বিশ্লেষণ কর।



পৃথিবীর বৃকে বিস্ময়, রহস্য আর ভয়ংকর সুন্দরের হাতছানি আর আকাশ হোঁয়ার স্পর্শ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেসব পর্বতশৃঙ্গ এদের মধ্যে রাজাধিরাজ হচ্ছে হিমালয়ের এভারেস্ট। মহাশূন্যের সঙ্গে যেন মিতালি গড়বার স্বপ্নে বিভোর ওই পাহাড়চূড়ো।

শ্বেতশূভ্র বরফে ঢাকা আর রহস্যের মায়াজালে বোনা এই পর্বতশৃঙ্গ বহু যুগ ধরে মৃত্যুময় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে মানুষকে। আর মানুষ অজ্ঞেয়, দুর্ভেদ্য প্রকৃতির সেই রহস্যকে জয় করার স্বপ্নে নেমেছে অভিযাত্রায়। ভয়ংকর বৈরী পরিবেশে আলিঙ্গন করেছে মৃত্যুকে। তবু খুব সহজে লুপ্তিত হতে দেয়নি নিজের গৌরব, বহুকাল ধরে পরাজয় মানেনি মাউন্ট এভারেস্ট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪৮ মিটার অর্থাৎ ২৯০২৮ ফুট উঁচু এই শৃঙ্গের গুরুত্ব প্রথম ধরা পড়ে ১৮৫২ সালে। বাঙালি এক তরুণ সার্ভেয়ার রাধানাথ শিকদার প্রথম অঙ্ক কষে দেখান যে, এভারেস্টই পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ। পরে সেই সময়কার ভারতবর্ষের ইংরেজ সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে এর নাম রাখা হয় এভারেস্ট। আর এখন এভারেস্ট নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে দুটো নাম আপনাআপনি ঠোঁটের ডগায় এসে পড়ে, তাঁরা হলেন তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি। কারণ এই সুবিশাল পর্বতচূড়োয় সর্বপ্রথম পদচিহ্ন ঐকে দিয়ে ঐরাই পরাজিত করেন এভারেস্ট শৃঙ্গকে। মানুষের অহংকার ও বিজয়ের গৌরবে অঙ্কিত করেন ইতিহাসের পাতা।

১৯৫৩ সাল। ২৪ হাজার ফুট উঁচুতে তাঁবু গাড়লেন জন হার্টের অভিযাত্রী দল। জর্জ লাওই এবং আলফ্রেড গ্রেগরির নেতৃত্বে সাহায্যকারী দল মালপত্র হাজির করল ওই তাঁবুতে। শেরপাদের কাঁধে খাবার এবং অক্সিজেন ট্যাংক। ২৮শে মে ২৭ হাজার ফুট উচ্চতায় অষ্টম তাঁবুটি ফেলা হল। কিন্তু আবহাওয়া এর মধ্যেই ভয়ানক খারাপ হয়ে ওঠে। শুরু হল প্রচণ্ড তুষারঝড়। অসহ্য শীত। আর পুরো এলাকা জুড়ে কুচি কুচি বরফবৃষ্টি। শীতের তীব্রতায় সারারাত জেগে কাটাতে হল সবাইকে।

তবু অভিযান বন্ধ হল না। এই প্রতিকূল আবহাওয়া উজিয়েই পরস্পর পরস্পরের কোমরে দড়ি বেঁধে চলতে লাগলেন সাবধানে। ভয়ানক বিপদসংকুল পথ। মুহূর্তের অসাবধানতা ডেকে নিয়ে আসতে পারে নির্ধাত মৃত্যু।

একবার পা পিছলে গেলেই কোন শূন্য অতল গহ্বরে চিরদিনের মতো হারিয়ে যেতে হবে তাদের। সুন্দর ঝকঝকে, শুভ্র বরফের চাদরে মোড়া চারদিক। হঠাৎ করেই ঘনকুয়াশায় ঢেকে যেতে পারে চোখের সীমানা কিংবা শুরু হতে পারে তুষারঝড়। শুধু কি তাই? ঝকঝকে আবহাওয়াতেও যে-কোনো সময় মৃত্যুদূতের মতো নেমে আসতে পারে তুষারধস। শেরপা তেনজিং কিন্তু এ সবকিছু ভালো করেই জানেন। কারণ এই পাহাড় আর পাহাড়ি প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়েছেন তিনি সারাটা জীবন। এই অষ্টম ক্যাম্পেও মালপত্রবাহী লাওই, জর্জ এবং শেরপা অ্যাং নামিমা প্রয়োজনীয় রসদ বহন করে এনেছেন।

হিলারি আর তেনজিং লক্ষ করলেন, এই উচ্চতায় আসতে পেরে সবাই বেশ খুশি। যদিও তাঁরা জানেন শেষ পা না-ফেলা পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না। হিলারি আর তেনজিং অক্সিজেন-ট্যাংক খুলে অক্সিজেন সাশ্রয় করলেন। জিনিসটা এখন বেশ হিসেব করে খরচ করতে হবে। অক্সিজেন-ট্যাংক খোলার পর দুজন বরফ কাটার কুড়ুল দিয়ে একটা ছোট বরফের চাতাল পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। জায়গাটা পরিষ্কার হতেই বেশ সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে গেল। তেনজিং এরপর স্যুপ গরম করতে লেগে গেলেন। আর হিলারি শুরু করলেন অক্সিজেন-ট্যাংকের হিসেব করতে। ইভান্স আর বর্দিগন অক্সিজেনের দুটো বোতল প্রায়-ভর্তি অবস্থায় রেখে যাওয়াতে বেশ সুবিধেই হল। অষ্টম তাঁবু পৌঁতা হয়েছিল দুপুর আড়াইটার দিকে। বিকেলবেলা বাতাসের বেগ কিছুটা কমে এল। এখন কেবল মাঝেমধ্যে তার ঝাপটা দশ-পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর। এভাবেই জানান দিয়ে যাচ্ছে তার উপস্থিতি।

বিস্কুট, সামুদ্রিক মাছ, খেজুর, খোরমা, জ্যাম আর মধু দিয়ে চমৎকার ভোজ্য সেরে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে গেলেন সবাই। ভোর চারটায় জেগে উঠলেন হিলারি। শুরু হল ২৯শে মে-র সকাল। তাপমাত্রা শূন্যেরও ১৬ ডিগ্রি নিচে। একটু পরে তেনজিং জেগে উঠলেন। তাঁবুর বাইরে এসে দেখলেন চমৎকার সকাল। বাতাস নেই। কুয়াশা নেই। চারপাশে শুধু শুভ্র বরফরাশি।

এখান থেকে ষোল হাজার ফুট নিচে বৌদ্ধমন্দিরটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এরকম পরিবেশে ঝটপট মন স্থির করে ফেললেন তাঁরা। সকাল সাড়ে ছ টায় শুরু হল তাঁদের যাত্রা। যে গিরিশিরা ধরে তাঁরা উঠেছিলেন, সেটি বরফের গুঁড়োয় ঢাকা। বেশ বিপজ্জনক। ২৮০০০ ফুট উপরে উঠে এলেন তেনজিং এবং হিলারি। এখানে গিরিশিরা সরু ছুরির একটা ফলার মতো হয়ে গেছে। সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে সকাল নয়টার মধ্যেই দক্ষিণশীর্ষে উঠে গেলেন তাঁরা। কিন্তু এখান থেকে কার্ণিশের মতো বরফের অংশটুকু পার হতে গিয়েই দেখা দিল মহা এক বিপত্তি। যে-কোনো মুহূর্তে তাদের ভারে ভেঙে যেতে পারে সেটা। আর ভাঙলেই তাদেরকে সোজা গিয়ে পড়তে হবে ১২০০০ ফুট নিচেকার খাদে। তাই বুদ্ধি বের করে বাড়তি ওজন কমিয়ে এক এক করে ওঠা শুরু হল।

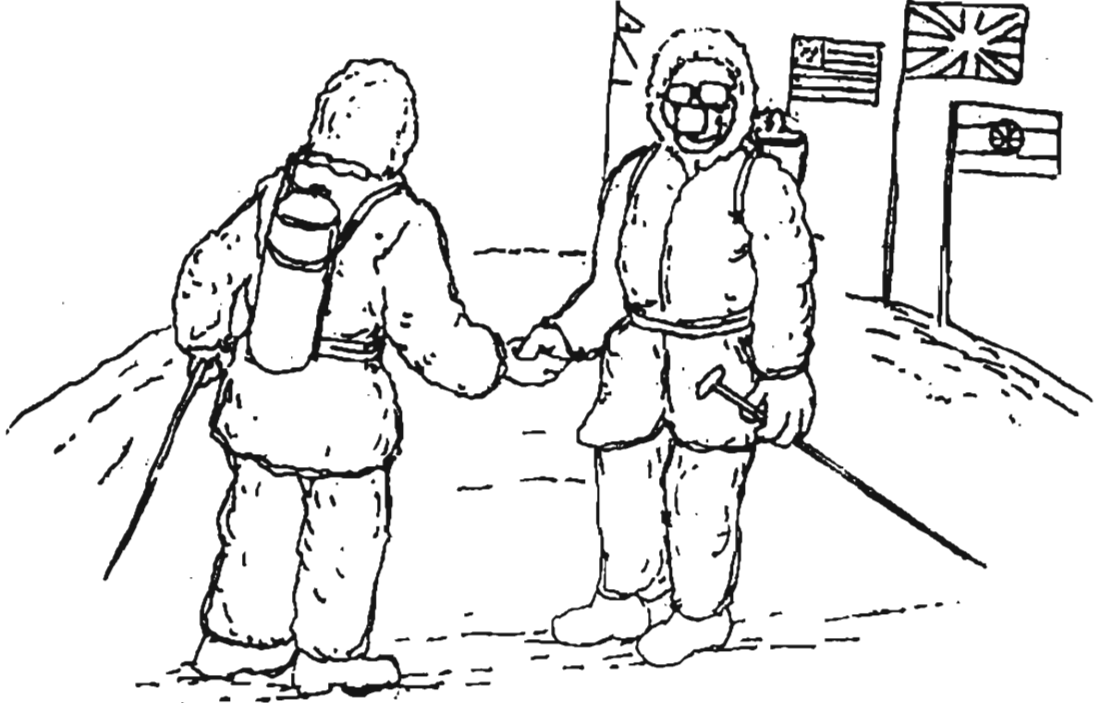
হঠাৎ করেই মাঝপথে এসে গোল বাধল তেনজিংকে নিয়ে। তাঁর অক্সিজেন নেয়ার নল বরফ জমে অকেজো হয়ে গেছে। তাই তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সেটা ঠিক করতে করতে হিলারিরও একই অবস্থা হতে যাচ্ছিল। কোনোমতে সেটা ঠিক করে কার্ণিশটুকু পার হওয়া গেল। এরপর খাড়া মসৃণ চল্লিশ ফুট গিরিগাত্র। আর এই গিরিগাত্রটা পার হলেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট পদানত হবে। হিলারি ও তেনজিং দুজনের মনে তখন আনন্দের হিল্লোল। হিলারি বয়স্ক মানুষ। তাছাড়া একটু ভারীও বটে। তাই তাঁর পক্ষে সামনের এই খাড়া গা বেয়ে উপরে ওটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে তেনজিং হালকা পাতলা, শক্তসমর্থ, চটপটে যুবক। হিলারি নিজেই আদেশ দিলেন তেনজিংকে এই বলে, আগে সে উপরে উঠে যাক, তারপর খুঁটি পুঁতে রশি ফেলে দিক—যাতে করে হিলারি সেই রশি ধরে কাক্ষিত শৃঙ্গশীর্ষে সহজেই উঠে আসতে পারেন।

তেনজিং শেরপা। তাঁর শরীরে পাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবার দুঃসাহসী তেজ, বুনো রক্ত। তেনজিং তাই তরতর করে উঠে গেলেন বাকি পথটুকু। নিচে থেকে হিলারি ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে এগারোটা। আর এই সময়টাতে রাজাধিরাজ এভারেস্টের মাথায় বিজয়ী তেনজিং পা রাখলেন। ছেলেবেলায় একবার তেনজিং-এর মাথায় একটা সাপ উঠেছিল

ঘটনাচক্রে। তাই দেখে, পাহাড়ি প্রবাদ মতে, সবাই বলত : তুমি একদিন রাজা হবে। সেই প্রবাদকে সত্যে পরিণত করেই যেন গিরিরাজের মাথায় সর্বপ্রথম পা রেখে রাজা হলেন শেরপা তেনজিং।

পদানত হল এভারেস্টের অহংকার। জয় হল মানুষের—সম্ভ্রামী, সাহসী মানুষের। আর এভাবেই একজন সাধারণ মানুষ হয়েই ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলেন তেনজিং নোরগে।

তেনজিং উপর থেকে রশি নামিয়ে টেনে তুললেন এবার হিলারিকে। তারপর দুজন মিলে এভারেস্টের চূড়ায় পুঁতে দিলেন নেপাল, ভারত, ব্রিটিশ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। ক্যামেরা বের করে কাঁপা-কাঁপা হাতে ঝটপট কয়েকটা ছবি তুললেন হিলারি। কেননা, অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছিল। তাই সময় কম।



এদিকে আগেই অক্সিজেন-ট্যাংক খুলে রেখেছিলেন হিলারি। আনন্দের আতিশয্যে সাতপাঁচ কোনোকিছু খেয়ালই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই শ্বাসকষ্ট শুরু হতেই ক্রমশ তাঁর হাত অবশ হয়ে আসতে লাগল। বুঝতে পারলেন, কপালে তাঁর কী ঘটতে চলেছে। দ্রুত অক্সিজেন-ট্যাংক তুলে নিলেন। এরপর হিলারি আর তেনজিং একটা মজার কাণ্ড করে বসলেন। এভারেস্টের চূড়ায় গর্ত করে তাতে রাখলেন কিছু খাবার, চকোলেট বার, বিস্কুট আর হার্ড কাভি। এভাবেই অতিবাহিত হল পনের মিনিট।

এবার ফেরার পালা। শেষবারের মতো চারপাশে তাকালেন তেনজিং আর হিলারি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা দাঁড়িয়ে বিশাল বিস্তৃত দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে নিজের তুচ্ছতার কথাও ভুলে যেতে হয়। কী অপূর্ব সুন্দর মৃত্যুময় চারপাশ। একেই বুঝি বলে ভয়ংকর সুন্দর। আর সেই সুন্দরের টানে, রহস্যের টানে, মানুষ সবকিছু তুচ্ছ করেও ছুটে যায়, যাবে।

না, আর দেরি নয়। তাঁবুতে ফেরার জন্য পা রাখলেন তেনজিং আর হিলারি। এভাবেই শেষ হল এভারেস্ট বিজয় অভিযান।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ

স্পর্ধা	-	বড়াই, অহমিকা।	বৈরি	-	শত্রু, দুশমন।
বিভোর	-	তন্ময়, আত্মহারা।	গহ্বর	-	গর্ত, খাদ, পর্বতগুহা।
শ্বেতশুভ্র	-	ধবধবে সাদা।	হার্ড ক্যান্ডি	-	শক্ত মেঠাই।
অজৈয়	-	যা জয় করা যায় না।	গিরিগাত্র	-	পর্বতের পাশের অংশ।
রাজাধিরাজ	-	রাজাদের রাজা, সম্রাট।	কন্দর	-	গর্ত, গিরিগুহা।
গিরিশিরা	-	পর্বতের চূড়ায় দীর্ঘ সরু উঁচু অংশ।			
উজিয়ে	-	বাধা পেরিয়ে, প্রতিকূলতা অতিক্রম করে।			
দুর্ভেদ্য	-	(দু+ভেদ্য), যা ভেদ করা কঠিন, যেখানে ঢোকা কষ্টকর।			
মৃত্যুময়	-	সব জায়গায় মৃত্যু ঝুঁপেতে আছে এমন এলাকা, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর আশংকায়ুক্ত।			

পাঠ-পরিচিতি

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট। হিমালয়ের চূড়ায় পা রাখার জন্য ১৮২৮ সাল থেকে সোয়া শ বছর ধরে চেষ্টা করেছে মানুষ। কিন্তু বার বারই এসেছে ব্যর্থতা। কারণ দুরারোহ দুর্গম হিমালয় সারা বছর থাকে তুষার-ঢাকা আর এর প্রতিটি কন্দরে রয়েছে মৃত্যুর হিমশীতল ফাঁদ।

কিন্তু তবুও মানুষ দমবার পাত্র নয়। অনেক অভিযাত্রীর ব্যর্থতা, অনেক অভিযাত্রীর নির্মম মৃত্যু সত্ত্বেও ১৯৫৩ সালে এক অভিযাত্রী দল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে শরিক হলেন এভারেস্ট বিজয় অভিযানে। অবশেষে সাফল্যের মুকুট পেলেন দুজন তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি।

এই বিপজ্জনক দুঃসাহসী অভিযানের শেষ দুটি দিনের ঘটনা-ধারার বিবরণ রয়েছে সংকলিত রচনাটিতে। লেখকের ‘বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ অভিযাত্রী’ গ্রন্থ থেকে এটি সংকলিত।

লেখক-পরিচিতি

সেজান মাহমুদের জন্ম ১৯৬৫ সালে, সিরাজগঞ্জ জেলার সমেশপুর গ্রামে। তাঁর প্রকৃত নাম সালেহ মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান

সেজান মাহমুদ পেশায় চিকিৎসক হলেও সাহিত্য রচনা করছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘মনের ঘুড়ি লাটাই’ ‘দ্বীপ পাহাড়ে আতঙ্ক’ ‘তুষার মানব’ ‘বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ অভিযাত্রী’ ‘অচিন জাদুকর’ ‘কালা কুঠরি’।

শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার পেয়েছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কন্দর শব্দের অর্থ কী ?
 - ক. গর্ত
 - খ. পর্বতের চূড়া
 - গ. পর্বতের গা
 - ঘ. পর্বতের চূড়ার দীর্ঘ সরু উঁচু অংশ
- ‘সাফল্যের মুকুট’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 - ক. সুন্দর টুপি
 - খ. বিজয়ের নিশান
 - গ. মূল্যবান পোশাক
 - ঘ. বাতাসের পোশাক

৩. চাঁদে কী আছে?

ক. বাতাস আছে

খ. পানি আছে

গ. কুয়াশা আছে

ঘ. বরফ আছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শ্বেতশূল বরফে ঢাকা আর রহস্যের মায়াজালে বোনা এই পর্বতশৃঙ্গা বহু যুগ ধরে মৃত্যুময় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে মানুষকে। আর মানুষ অজেয়, দুর্ভেদ্য প্রকৃতির সেই রহস্যকে জয় করার স্বপ্নে নেমেছে অভিযাত্রায়। ভয়ংকর বৈরী পরিবেশে আলিঙ্গান করেছে মৃত্যুকে। আর এখন এভারেস্ট নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে দুটো নাম আপনাআপনি ঠোঁটের ডগায় এসে পড়ে, তাঁরা হলেন তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি। কারণ এই সুবিশাল পর্বতচূড়ার সর্বপ্রথম পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে এঁরই পরাজিত করেন এভারেস্ট শৃঙ্গকে। মানুষের অহংকার ও বিজয়ের গৌরবে অঙ্কিত করেন ইতিহাসের পাতা।

ক. মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা কত ফুট?

খ. ‘ভয়ংকর বৈরী পরিবেশে আলিঙ্গান করেছে মৃত্যুকে’। – ‘ভয়ংকর বৈরী পরিবেশ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত ‘তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি’র এভারেস্ট শৃঙ্গা বিজয় অভিযান – আমাদেরকে প্রতিকূল পরিবেশ/ বৈরী পরিবেশ মোকাবেলায় কীভাবে প্রেরণা যোগাবে?

ঘ. ‘মানুষের অহংকার ও বিজয়ের গৌরবে অঙ্কিত করেন ইতিহাসের পাতা’। – বাক্যটি অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হিমালয়ের চূড়ায় পা রাখার জন্য ১৮২৮ সাল থেকে প্রায় সোয়াশো বছর ধরে চেষ্টা করেছে মানুষ। কিন্তু বারবারই এসেছে ব্যর্থতা। কারণ দুর্গম হিমালয়ে সারা বছর থাকে তুষার ঢাকা আর মৃত্যুর হিমশীতল ফাঁদ। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গা যাঁরা দাঁড়াতে পেরেছেন তাঁরা দেখেছেন অপূর্ব সুন্দর মৃত্যুময় চারপাশ। একেই বলে ভয়ংকর সুন্দর। আর সেই সুন্দরের টানে, রহস্যের টানে, মানুষ সবকিছু তুচ্ছ করে ছুটে যায়, যাবে।

ক. হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?

খ. ‘মৃত্যুময় চারপাশ’ দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ. আর সেই সুন্দরের টানে, রহস্যের টানে, মানুষের ছুটে যাওয়ার আকর্ষণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘একেই বলে ভয়ংকর সুন্দর’-এই উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩.২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মানুষ অজেয় ও দুর্ভেদ্য প্রকৃতির রহস্যকে জয় করার স্বপ্নে নেমেছে অভিযাত্রায়। ভয়ংকর বৈরী পরিবেশে আলিঙ্গান করেছে মৃত্যুকে। বহুকাল ধরে পরাজয় মানেনি মাউন্ট এভারেস্ট। তবুও মানুষ দমবার পাত্র নয়। অনেক অভিযাত্রীর ব্যর্থতা, অনেক অভিযাত্রীর নির্মম মৃত্যু সত্ত্বেও ১৯৫৩ সালে এক অভিযাত্রী দল মৃত্যুকে আলিঙ্গান করে শরিক হলেন এভারেস্ট বিজয় অভিযানে। অবশেষে সাফল্যের মুকুট পেলেন দুজন-তেনজিং ও হিলারি। প্রমাণিত হল ব্যর্থতা সফলতার ভিত্তি।

ক. কার নাম অনুসারে এভারেস্ট-এর নামকরণ করা হয়?

খ. ‘বহুকাল ধরে পরাজয় মানেনি মাউন্ট এভারেস্ট।’-এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. জীবনে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে উদ্দীপক থেকে কী শিক্ষা পাও – বর্ণনা কর।

ঘ. ‘ব্যর্থতা সফলতার ভিত্তি’ – উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

মহান বিজ্ঞানী জগদীশ

বন্দে আলী মিয়া



গাছেরও যে প্রাণ আছে এবং দুঃখ ও সুখের অনুভূতি আছে—একথা কে আগে কল্পনা করতে পেরেছিল? এই বাংলাদেশেরই একজন কৃতি বিজ্ঞানী আধুনিক যুগের জগদ্বাসীর সামনে প্রমাণ করে দেখালেন, উদ্ভিদের মধ্যেও রয়েছে প্রাণশক্তি। এই বিজ্ঞানীর নাম জগদীশচন্দ্র বসু।

আজকাল প্রায় সর্বত্র ‘রেডিও’ বা বেতারযন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কে এই বেতারযন্ত্রের আবিষ্কারক এবং কীভাবেই বা সেটা আবিষ্কৃত হল, সে বৃত্তান্ত হয়তো অনেকেই জানেন না।

বেতারযন্ত্রের আবিষ্কারক হিসেবে মার্কোনি আজ জনসমাজে পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞানার্চাৰ্জ জগদীশচন্দ্র বসু বেতারবার্তার সূত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি তাঁর বিজ্ঞানসাধনার বস্তুকে ব্যবসায় প্রচলন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সে— কারণে পাশ্চাত্য জগৎ মার্কোনিকে বেতারবার্তার আবিষ্কারক হিসেবে সত্বর্ধনা জানাল এবং তাঁর নাম চারদিকে প্রচার করল। মার্কোনিই আবিষ্কারকের সম্মানে ভূষিত হলেন। সমগ্র দুনিয়াতে আজ তাঁর জয়ধ্বনি চলছে। তথাপি জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি সত্যজগৎ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্র বসু ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাঢ়ীখাল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু ও মায়ের নাম বামাসুন্দরী দেবী।

জগদীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল ফরিদপুরে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে লিখেছেন : “শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার চাপরাসীর পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর বৃত্তান্ত স্তম্ভ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানের আমার অনুরাগ এইসব ঘটনা হইতে মনে বন্দনমূল হইয়াছিল।”

ফরিদপুর পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত হলে ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করা হল। মাত্র তিন মাস পরে তাঁকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল। ইংরেজি ভাষা ভালোরকম শিখতে পারবেন বিবেচনা করে তাঁকে ভর্তি করা হল সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। জগদীশচন্দ্র ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবেশ করলেন। সে সময়ে ফাদার ল্যাফৌ ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর সাহচর্যে চার বছর কাটাবার পরে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ডাক্তারি পড়বার জন্য বিলাত যাত্রা করলেন তিনি।

জগদীশচন্দ্র কলেজে পড়বার সময়ে আসামে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রবল জ্বর নিয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। সেই জ্বরে তাঁকে মাঝে মাঝে ভুগতে হত। জাহাজে তিনি সেই জ্বরে হঠাৎ আক্রান্ত হলেন। জাহাজের ডাক্তার তাঁকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর ডাক্তারি পড়বার জন্য মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলেন। কিন্তু জ্বর তাঁর পিছু লেগে রইল। এক বছর ডাক্তারি পড়বার পর অধ্যাপকেরা পরামর্শ দিলেন ডাক্তারি পড়া ত্যাগ করে অন্যকিছু করবার জন্য। কারণ, মেডিক্যাল কলেজের অত হাড়ভাঙা খাটুনি তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

একটি বছর বৃথা গেল। ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসে জগদীশচন্দ্র লন্ডন ত্যাগ করে কেম্ব্রিজে গমন করলেন। কেম্ব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং উদ্ভিদতত্ত্ব পড়তে লাগলেন। কিন্তু জ্বর তাঁর পিছু লেগে রইল। শেষে তিনি প্রত্যহ দুবেলা নৌকায় দাঁড় টানতে আরম্ভ করলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ব্যাধির হাত থেকে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন। তিন বৎসরকাল কেম্ব্রিজে অধ্যয়নের পরে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানে ট্রাইপোস পাস করলেন এবং এর অতি অল্পকাল পরে বি.এসসি. ডিগ্রি নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন।

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করলেন। সে চাকরিতে ইংরেজ ও ভারতবাসীদের বেতনে যথেষ্ট তারতম্য ছিল। ইংরেজ কর্মচারীরা যে বেতন পেতেন, ভারতীয় কর্মচারীরা পেতেন তার তিন ভাগের দু ভাগ। তদুপরি বেতন গ্রহণের সময় তিনি জানতে পারলেন, তিনি অস্থায়ীভাবে চাকরি করছেন, এজন্য তাঁর বেতনের অর্ধেক কেটে নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি মনে মনে চটে গেলেন। তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। তিনি বেতন গ্রহণ করলেন না। শুধু দু-এক মাস নয়—দীর্ঘ তিনটি বছর জগদীশচন্দ্র বেতন না নিয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি করলেন। পরে অবশ্য পুরো তিন বছরের সমুদয় বেতন একসঙ্গে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সপ্তাহে ছাব্বিশ ঘণ্টা অধ্যাপনা করতে হত। বাকি সময়টা তিনি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে গবেষণাকার্য চালাতেন।

সে সময় কলেজের ল্যাবরেটরি ছিল অতিশয় নগণ্য। মৌলিক গবেষণাকার্য করবার মতো বিশেষ যন্ত্রপাতি সেখানে ছিল না। জগদীশচন্দ্র মৌলিক গবেষণাকার্য চালাবার জন্য আপন তত্ত্বাবধানে এদেশীয় মিস্ত্রি দিয়ে বহু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। এতে যা— কিছু খরচ হত তা তিনি নিজেই বহন করতেন। নানারকম অসুবিধার মধ্যে থেকেও জগদীশচন্দ্র আপন কতব্য ও সাধনায় অবিচল রইলেন। তাঁর বিজ্ঞান— সম্পর্কীয় প্রবন্ধাদি বিলাতের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হতে লাগল। ইউরোপের বিজ্ঞানী পণ্ডিতের দল তাঁর প্রবন্ধাদি পাঠ করে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ১৮৯৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁকে ডি.এস.সি. উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করলেন। জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

প্রথম জীবনে জগদীশচন্দ্র ইখার-তরঙ্গ এবং বিদ্যুৎ বিষয়ে স্বাধীন মতানুসারে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। এর ফলস্বরূপ বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণের কল্পনা তাঁর চিন্তায় জেগে ওঠে। এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে করতে বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণের বহু তথ্য আবিষ্কার করতে তিনি সক্ষম হন।

এসব তথ্য ছিল তৎকালীন সমাজের অজানা। আমেরিকায় লজ এবং ইটালিতে মার্কোনি এই দুজন বিজ্ঞানী বেতারে সংবাদ প্রেরণ বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু এই অজ্ঞাত রহস্যের সম্ভান পেয়েছিলেন এবং সর্বসমক্ষে সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেছিলেন বাংলাদেশের তরুণ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু।

বিনা-তারে শব্দ প্রেরণের যে যন্ত্রটি তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন সেটির সাহায্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী তাঁর বাসভবনে সাংকেতিক শব্দ প্রেরণ করতে তিনি সমর্থ হন।

ঠিক সেই সময়ে তাঁকে অদৃশ্য-আলোক সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদানের জন্য ইংল্যান্ড যেতে হল। বেতারের কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে তাঁকে চলে যেতে হল। সেই সময় যদি জগদীশচন্দ্র বেতারযন্ত্র নিজের নামে পেটেন্ট করতেন, তবে মার্কোনির নামের পরিবর্তে বেতার-আবিষ্কর্তারূপে জগদীশচন্দ্রের নাম উচ্চারিত হত। বাঙালি বিজ্ঞানী আজ যশের মালা কণ্ঠে ধারণ করতেন। পৃথিবীময় খ্যাতির সজ্জা তিনি কোটি কোটি টাকাও পেতে পারতেন।

জগদীশচন্দ্র ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে পত্নী অবলা বসুকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যান্ডে যান, লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় বক্তৃতা দিতে। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল অদৃশ্য-আলোক সম্পর্কে। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ, লর্ড কেলভিন প্রমুখ সুধীজন জগদীশচন্দ্রকে বিলাতেই অধ্যাপনা করবার জন্য অনুরোধ জানানেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে পারলেন না। বললেন, ‘এখানের আবহাওয়া আমার সহ্য হবে না’।

এরপর লন্ডনে রয়েল ইনস্টিটিউটে বক্তৃতাদানের জন্য জগদীশচন্দ্রকে আহ্বান করা হয়েছিল। এখানে বক্তৃতা প্রদানের ভাগ্য সকল বিজ্ঞানবিদের হয় না। যাঁরা উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী, যাঁরা মৌলিক গবেষণা করেন, তাঁরাই কেবল এই বিজ্ঞানভবনে বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরে এলেন। এবার তিনি জড় এবং অচেতনের সাড়া সম্বন্ধে তত্ত্ব আবিষ্কারে মনোযোগ প্রদান করলেন।

পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র লন্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ভিয়েনা, প্যারিস, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, শিকাগো, টোকিও, ক্যালিফোর্নিয়া, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানের বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর নতুন আবিষ্কারসমূহ দেখান এবং বিশ্বের জয়মাল্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

১৯১৭ সালে জগদীশচন্দ্রের আজীবন সাধ ও স্বপ্ন পূর্ণ হল। ৩০ নভেম্বর তারিখে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথমবার বিলাতে গিয়ে তিনি রয়েল ইনস্টিটিউট দেখে সেই ধরনের একটি বিজ্ঞানভবন প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছিলেন। এতদিনে তা বাস্তবে পরিণত হল। ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’টি যেন বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অপূর্ব সমন্বয়। এটা নির্মাণ করতে জগদীশচন্দ্র পাঁচ লক্ষেরও অধিক মুদ্রা খরচ করেছেন। এই বিজ্ঞানভবন অবিভক্ত বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম করেছে।

‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ তৈরির কিছু পূর্বে জগদীশচন্দ্র ‘ক্রেস্কোগ্রাফ’ নামে এক অভূতপূর্ব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। উদ্ভেজনাৎ অথবা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করে গাছের বৃদ্ধি কেমন বদলে যায় সেটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে দেখবার জন্যই এই যন্ত্রটি। গাছের বৃদ্ধি এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা চলে। যন্ত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দশ লক্ষ থেকে এক কোটি গুণ বড় হয়ে পড়ে। অম্লকার ঘরে একটা গাছের ওপরে আলো ফেলা হল। তারপর গাছকে খাবার দেওয়া হল অথবা সামান্য একটু বিষ দেওয়া হল অথবা ছোট একটু চিমটি কাটা হল। গাছের ওপরে এসবের ক্রিয়া কী হয় তা চোখে দেখা অসম্ভব। কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে গাছের স্পন্দন লেখা হয়ে গেল। তাই দেখে ক্রিয়ার তারতম্য বুঝতে পারা যায়।

জগদীশচন্দ্র আপনার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন, তরুলতা প্রাণহীন নয়। তারা আহার করে, ঘুমায়ে, সুখ-দুঃখ অনুভব করে থাকে। তারা আঘাতে সাড়া দেয়, বৃন্দ্বি পায় এবং জীবনের শেষে মরে যায়।

জগদীশচন্দ্র কেবল যে বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাই নয় — তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আকর্ষণ ছিল। বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ‘অব্যক্ত’ বাংলাভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তাঁকে প্রায়ই নানা অসুখে ভুগতে হয়েছে। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর সকাল আটটায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তিনি যে অপরিসীম দান রেখে গেলেন বিশ্ববাসীর জন্য, তা অক্ষয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

জগদীশচন্দ্র তাঁর উপার্জিত সতের লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে তের লক্ষ টাকার সম্পত্তি ‘বিজ্ঞান মন্দির’— এর ট্রাস্টিদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। অবশিষ্ট চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করা হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জগদীশচন্দ্রের গুণগ্রাহী।

জগদীশচন্দ্র যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীসমাজে সমাদর ও সম্মানে বিভূষিত হয়েছিলেন সেই সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিঞ্চুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি, জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।



শব্দার্থ ও টীকা

ট্রাইপোস	-	গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন — তিন বিষয়ে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর সম্মান।
ট্রাস্টি	-	গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠান রক্ষার দায়িত্ব বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ন্যাসরক্ষক।
পেটেন্ট	-	সরকারি সনদ অনুযায়ী আবিষ্কার, মালিকানা ইত্যাদি সংক্রান্ত সংরক্ষণ অধিকার।
পাশ্চাত্য	-	ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশ বা এসব অঞ্চল সম্পর্কিত।
সাহচর্য	-	সঙ্গে সঙ্গে থাকা, সঙ্গীর ভূমিকা, সঙ্গে দান করা।
লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা	-	প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন, বিখ্যাত, খ্যাতিমান।
যথাসাধ্য	-	সাধ্যমতো, ক্ষমতা অনুসারে, সামর্থ্য অনুযায়ী।
মৌলিক	-	প্রথম উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট, মূল দিক সংক্রান্ত।
সংবর্ধনা	-	বিশেষভাবে সম্মান জানানো।
চাপরাসি	-	পেয়াদা, আরদালি।
ধীবর	-	জেলে।
বৃত্তান্ত	-	বিবরণ।
অপরিসীম	-	সীমাহীন, অপরিমিত।
	ভূষিত	- অলংকৃত, শোভিত।
	ব্যাপ্ত	- বিস্তৃত, প্রসারিত।
	যশ	- সুখ্যাতি, সুনাম।
	পাণ্ডিত্যপূর্ণ	- অগাধ জ্ঞানমণ্ডিত।
	জড়	- প্রাণহীন, অচেতন।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশের কৃতী সন্তান জগদীশচন্দ্র বসু হলেন সারা বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জনকারী প্রথম সফলকাম বাঙালি বিজ্ঞানী। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছিল ফরিদপুর শহরের এক বিদ্যালয়ে। প্রকৃতির প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের সূচনা হয় সেখানেই। আর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার ল্যাফৌর সাহচর্যে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অসাধারণ আকর্ষণ জন্মে।

বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ভাগ্যচক্রে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৮৮৫ সালে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং এরই পাশাপাশি পদার্থবিদ্যায় একাধিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

এ গবেষণায় প্রথম সাফল্য ছিল ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে সংকেত বা সংবাদ প্রেরণের সম্ভাবনা আবিষ্কার। জগদীশচন্দ্র ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কোনির আগেই বেতারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু নিজের নামে পেটেন্ট না-করায় মার্কোনিই আবিষ্কারকের সম্মানে ভূষিত হন। অবশ্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি বিজ্ঞানীমহল যথাযথ সম্মান জানিয়ে এসেছেন। শুধু বেতারযন্ত্র নয়, নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ধর্ম বিশ্লেষণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে উত্তেজনা জনিত সাড়ার আবিষ্কার, ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদদেহের সামান্য সাড়াকে লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে প্রদর্শন ইত্যাদি তাঁর অবিস্মরণীয় আবিষ্কারগুলোর কয়েকটি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে তিনি অবিশ্বাস্য আবিষ্কারগুলো প্রদর্শন করেন। বিলাতের বিখ্যাত পত্রিকায় নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেও তিনি তাঁর গবেষণা-লব্ধ ফলাফল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিগোচর করেন। এভাবেই তিনি অর্জন করেন বিশ্বের বিজ্ঞান পরিমন্ডলের শ্রদ্ধা ও জয়মালা, সম্মান ও উপাধি।

জগদীশচন্দ্র বাংলাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনারও অন্যতম পথিকৃৎ। অবিভক্ত বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ও প্রসারের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ১৯১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ বা বোস গবেষণা ইনস্টিটিউট।

এই মহান বিজ্ঞানীর কর্মকৃতি সম্পর্কিত রচনাটি বন্দে আলী মিয়ার লেখা ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ রচনা থেকে সর্জনস্বত্বরূপে সংকলিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২০০ গ্রন্থ রচনা করেছেন বন্দে আলী মিয়া। কিন্তু শিশুসাহিত্যিক হিসেবেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত।

পাবনা জেলার রাখানগর গ্রামে ১৯০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর বন্দে আলী মিয়ার জন্ম হয়।

১৯২৩ সালে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান ও পালাগান রচনা করে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪ সালের প্রথমদিকে ঢাকা বেতারে এবং পরে রাজশাহী বেতারে কাজ করেন। তিনি বেশকিছু শিশুতোষ বইও লিখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে : ‘বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা’, ‘গল্পের আসর’, ‘মেঘকুমারী’, ‘মৃগপরী’, ‘শিকারের গল্প’, ‘অরণ্যের বিভীষিকা’, ‘তিন আজগুরি’, ‘বোকা জামাই’, ‘কুচবরণ কন্যা’, ‘গুপ্তধন’, ‘শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালা’, ‘রীতিমত কাণ্ড’, ‘পাতাবাহার’, ‘ছুটির দিন এলো’, ‘ভুতুড়ে কাণ্ড’ ইত্যাদি।

শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৭৯ সালে রাজশাহীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



জীবনের জন্য

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

আমেরিকার কাছ দিয়ে সমুদ্রপথে একটি যাত্রী-জাহাজে এক ইংরেজ-দম্পতি যাচ্ছিলেন। সঙ্গে তাদের কয়েকটি ছেলেমেয়ে। বড়মেয়েটির বয়স আঠার বছর হবে। ইঠাৎ জাহাজের কাস্তানের কানে দূরের একটি জাহাজের বিপদ-সংকেতের ধ্বনি এসে লাগল। কাস্তান দূরবীন দিয়ে দেখলেন, বহুদূরে একটি জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাবিকদের তিনি সেদিকে জাহাজ চালাতে হুকুম দিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে বিপন্ন জাহাজের কাছে গিয়ে দেখা গেল, জাহাজটি জনমানবশূন্য। মাত্র দু-তিন জন লোক বিষণ্ণমনে ডেকের একপাশে মলিনমুখে বসে আছে। নতুন জাহাজটি বিপন্ন জাহাজের পাশে লাগাতেই তারা উঠে এল। সমস্ত যাত্রী তাদের কী বিপদ তা জানবার জন্য সমুৎসুক হয়ে জাহাজের একপাশে এসে দাঁড়ালেন।

কাস্তানের প্রশ্নের উত্তরে তারা জানাল, ভীষণ কালাজ্বরে সবাই মারা গিয়েছে, যারা এখনও মরেনি তারাও মরার মতো হয়ে কেবিনে পড়ে আছে। তাদের দেখবার কেউ নেই। তারা মাত্র তিনটি প্রাণী ভালো আছে।

কালাজ্বরের কথা শুনে যাত্রীদের ভেতর একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল, কারণ এই জ্বর ভয়ংকর ইয়াচে-এ জ্বর হলে রোগী মরবেই।

কাস্তান গম্ভীরভাবে যাত্রীদের লক্ষ করে বললেন—যাত্রীদের মাঝে এমন কেউ কি নেই, যিনি এই বিপন্ন লোকগুলোকে সাহায্য করবার জন্য যেতে পারেন? একথাও বলছি, যিনি এদের মাঝে যাবেন, তাঁর প্রাণের আশা খুব কম। মরবার পণ করেই এদের মাঝে যেতে হবে।

কেউ কথা বলছিল না। কাস্তান আবার বললেন, এখানে যাত্রীর সংখ্যা অল্প, কিন্তু তবু মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবার মতো কি কেউ নেই?

একটি মেয়ে বলল, ‘আমি এদের মাঝে যাব।’ সবার মুখ প্রশংসা ও শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যে ইংরেজ-দম্পতির কথা বলছিলাম এই মেয়েটি তাঁদেরই।



মহাপ্রাণ যুবতীটির মা কেঁদে বললেন, ‘মা, তুমি প্রাণ দেবার জন্য এদের মাঝে যাবে? তুমি মরো না, বেঁচে থাকো। আমার মরবার সময় হয়েছে, আমি এদের মাঝে যাব।’

মেয়ে বলল—‘না মা, সে কি হয়? দেখ আমি এখনও অবিবাহিত, আমার জীবনের মূল্য নেই। আমার মৃত্যুতে জগতের বিশেষ কিছু আসবে যাবে না, তুমি গেলে তোমার এ ছোট শিশুগুলোর যত্ন করবে কে?’ মেয়েটির পিতা অশ্রুসিক্ত চোখে বললেন, ‘মা বুড়ো হয়েছি, আমার জীবনের মূল্য খুব কম। তোমরা বাড়ি যাও, আমিই বিপন্নদের সেবা করতে যাব।’ কন্যা বলল—‘বাবা, তুমি গেলে আমার ভাইবোনগুলো আর কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে? আর তুমি পুরুষ, তোমার কি সেবা-শুশ্রূষা করা সাজে? দয়া করে আমাকে অনুমতি দাও। সেবা দ্বারা জীবনকে ধন্য করবার সুযোগ আমাকে দাও। জীবনকে সুব্যবহার করার এমন সুযোগ সবসময় ঘটে না।’

সময় সঞ্চিত। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবার সময় ছিল না। পিতা স্নেহে কন্যার ললাট চুম্বন করলেন। মা, কন্যাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সজ্জল নয়নে বললেন, ‘মা ধন্য তোমার জীবন। তোমাকে পেটে ধরে আমিও আজ ধন্য হলাম।’

জাহাজের যাত্রীরা সবাই এসে বালিকাটির সাথে করমর্দন করলেন। ছোট ভাইবোনগুলোকে একবার কোলে করে এই মহাপ্রাণ বালিকা বিপন্ন জাহাজে নেমে গেলেন।

[পরিমার্জিত]

চারুপাঠ

শব্দার্থ

ক্যাপ্টেন	- ক্যাপ্টেন, জাহাজের পরিচালক।	সমুৎসুক	- (সম+উৎসুক) খুবই আগ্রহী।
দম্পতি	- স্বামী ও স্ত্রী, পতি ও পত্নী, জায়া ও পতি।	চঞ্চলতা	- চঞ্চলতা, অস্থিরতা।
বিপন্ন	- বিপদে পতিত, বিপদগ্রস্ত।	অশ্রুসিক্ত	- চোখের পানিতে ভেজা।
		শুশ্রূষা	- রোগীর সেবা বা পরিচর্যা।

পাঠ-পরিচিতি

আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, বিপন্ন মানুষের পাশে সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এমন মানুষ আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। এঁদের সবাই যে মহামানব তা নয়। আমাদের চারুপাঠের সাধারণ মানুষের মধ্যেই তাঁরা আছেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁরা এগিয়ে আসেন।

এমন একজন সাধারণ মেয়ের অসাধারণ সেবাব্রতী ভূমিকার কথা বলা হয়েছে ‘জীবনের জন্য’ রচনাটিতে। এটি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের ‘মহৎ জীবন’ গ্রন্থ থেকে কিছুটা পরিমার্জিত করে সংকলিত হয়েছে।

আমেরিকার পথে যাচ্ছিলেন কয়েকজন ছেলেমেয়েসহ এক ইংরেজ-দম্পতি। অন্য একটি জাহাজের কাছ থেকে বিপদ সংকেত পেয়ে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজ চালালেন বিপন্ন জাহাজের দিকে। কাছে এসে জানা গেল ভীষণ কালোজ্বরে ঐ জাহাজের অধিকাংশ যাত্রী মারা গেছে। বাকিরা মৃত্যুশয্যায়। কেবল তিন জন লোক তখনও সুস্থ আছেন। ক্যাপ্টেন তার জাহাজের যাত্রীদের মধ্য থেকে সেবাব্রতী হিসেবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালে এতে সাড়া দিয়ে ইংরেজ-দম্পতির আঠার বছরের মেয়েটি এগিয়ে আসে। কন্যাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে অনিচ্ছুক মা-বাবা তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তার পরিবর্তে নিজেরা দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেবাব্রতী মেয়েটি তাদের বোঝায় যে, সংক্রামক কালোজ্বরে তাদের মৃত্যু হলে তার ভাইবোনেরা নিঃসহায় হয়ে পড়বে। অথচ তার নিজের মৃত্যু হলে কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ কেউ তার ওপর নির্ভরশীল নয়।

মেয়ের এই অকাট্য যুক্তি মা-বাবা মেনে নেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েটি বিপন্ন জাহাজে ওঠে তাদের সেবা করার জন্য।

মেয়েটির এই সহানুভূতিশীল মানসিকতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে অন্যের সেবার আত্মত্যাগে এগিয়ে যেতে।

লেখক-পরিচিতি

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের আলোকে মানবজীবনের মহান আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই মানুষকে উন্নত জীবন ও মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে গেছেন তাঁর ‘উন্নত জীবন’, ‘মহৎ জীবন’, ‘সত্য জীবন’, ‘মানব জীবন’ ইত্যাদি গ্রন্থে। এসব গ্রন্থ ছাড়াও তিনি কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। প্রথমে শিক্ষকতা, করলেও পরবর্তী জীবনে তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। নারীসমাজের উন্নতির জন্য ‘নারীতীর্থ’ নামে সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ‘নারীশক্তি’ নামে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

লুৎফর রহমানের জন্ম মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

লুৎফর রহমান কয়েকটি শিশুতোষ গ্রন্থও লিখেছেন। এগুলো হল : ‘রানী হেলেন’, ‘ছেলেদের মহৎ কথা’ ও ‘ছেলেদের কারবালা’।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোহাম্মদ লুতফর রহমান নারীসমাজের উন্নতির জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন ?
 ক. নারীতীর্থ
 খ. নারীশক্তি
 গ. নারীসেবা
 ঘ. নারীকল্যাণ
২. বহুদূরে একটি জাহাজে স্থির দাঁড়িয়ে আছে কেন ?
 ক. সাগরে পানি কম বলে
 খ. ঝড়ের আশঙ্কায়
 গ. নাবিক নেই বলে
 ঘ. যাত্রীরা কালাজ্বরে মারা গেছে বলে
৩. ‘জীবনের জন্য’ গল্পটি পড়ে তুমি কী প্রেরণা পেয়েছ ?
 ক. সংক্রামক ব্যাধি থেকে দূরে থাকা
 খ. দুঃসময়ে আপনজনদের সাহায্য করা
 গ. রোগ-ব্যাধিতে সতর্ক থাকা
 ঘ. নিজের জীবনের চিন্তা করা
৪. ‘জীবনের জন্য’ গল্পে অনুকরণীয় আদর্শ কোনটি?
 i. মহত্ত্ব
 ii. সততা
 iii. সেবার মনোভাব

সঠিক উত্তর কোনটি?

- | | |
|-------|-----------|
| ক. ii | খ. iii |
| গ. i | ঘ. i ও ii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কাপ্তান গম্ভীরভাবে যাত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন—যাত্রীদের মাঝে এমন কেউ কি নেই, যিনি এই বিপন্ন লোকগুলোকে সাহায্য করবার জন্য যেতে পারেন? একথাও বলছি— যিনি তাদের মাঝে যাবেন, তাঁর প্রাণের আশা খুব কম। মরবার পণ করেই এদের মাঝে যেতে হবে।

- ক. কাপ্তানের আহ্বানে কে সাড়া দিয়েছিল ?
- খ. উক্ত যাত্রী কিসের প্রেরণায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল— ব্যাখ্যা কর।
- গ. যাত্রীর এই সাহসিকতা থেকে তুমি কী শিক্ষালাভ করলে—উপস্থাপন কর।
- ঘ. কী গুণের অধিকারী হলে একজন মানুষ কাপ্তানের এ আহ্বানে সাড়া দিতে পারে— বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সময় সংক্ষিপ্ত। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার সময় ছিল না। পিতা স্নেহে কন্যার ললাট চুম্বন করলেন। মা, কন্যাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সজল নয়নে বললেন, ‘মা, ধন্য তোমার জীবন। তোমাকে পেটে ধরে আমিও আজ ধন্য হলাম।’ জাহাজের যাত্রীরা সবাই এসে বালিকাটির সাথে করমর্দন করলেন। ছোট ভাইবোনগুলোকে একবার কোলে করে এই মহাপ্রাণ বালিকা বিপন্ন যাত্রীদের জাহাজে নেমে গেলেন।

- ক. মেয়েটির আত্মত্যাগের আগ্রহ দেখে তার পিতা-মাতা ছাড়া আর কে বিপন্ন যাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে চাইল।
- খ. জাহাজের যাত্রীরা কেন যুবতী মেয়েটির সাথে করমর্দন করতে এগিয়ে আসল?
- গ. মেয়েটি জাহাজে নেমে যাওয়ার আগে পিতা-মাতা ও ভাইবোনের সঙ্গে যে আচরণ করল তা থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ? লেখ।
- ঘ. ‘মা, ধন্য তোমার জীবন, তোমাকে পেটে ধরে আমিও আজ ধন্য হলাম।’ উদ্দীপকের আলোকে মায়ের একথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।



আমি বুলগেরিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম বাংলাদেশের একজন সংস্কৃতিসেবী হিসেবে। এখানকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দেখেছি, আলাপ-আলোচনা করেছি। তা করতে গিয়ে এখানকার এমন এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্মান লাভ করেছি, যা একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এ অঞ্চলের নাম গ্যাব্রোভো।

‘গ্যাব্রোভোবাসীর হাস্য-পরিহাস’ দিয়েই শহরটি। না, শুধু শহর নয়, সমগ্র অঞ্চলটি সর্বত্র প্রসিদ্ধ ও চিরপরিচিত। এ দিয়েই শহরটি এখন বিশ্ববিখ্যাত বলে বুলগেরিয়ানরা দাবি করে থাকেন।

‘হাস্য-পরিহাস ভবন’ নামে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান বিশ্বের কোথাও নিয়মিতভাবে পালন করা হয় কিনা, আমার জানা নেই। অথচ এমন একটা অনুষ্ঠান প্রতি দু-বছর অন্তর একনাগাড়ে দশদিনের জন্য এদেশের গ্যাব্রোভো শহরে নিয়মিতভাবে পালিত হয়ে আসছে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—আশ্চর্য অনুষ্ঠান। এতে স্থানীয় ও বহিরাগত নরনারীর চালচলন, সাজগোজ, পোশাক-আশাক, বোলচাল প্রভৃতি সবকিছু মিলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা দেখলে না হেসে পারা যায় না। দেশ-দেশান্তর থেকে বহু কৌতুকামোদী ও অনেক কার্টুন-আঁকিয়ে এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে নিজ নিজ শিল্পচর্চায় অংশ নেন। এ বিশিষ্ট অনুষ্ঠান থেকেই গ্যাব্রোভোর মজাদার আখ্যায়িকার (anecdote) খ্যাতি এখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

গ্যাব্রোভো শহরে প্রবেশ করতেই এর প্রধান ফটকে সর্বাত্মে যা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে একটা লেজকাটা বেড়ালের চিত্র। তারপর রাস্তার বিপণি বিতানে, দোকানে দোকানে, প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় বুলছে সেই লেজকাটা বেড়ালের ছবি। এ ছবিকে গ্যাব্রোভো শহরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা যায়। প্রধানত এ কারণেই নগরটিকে অনেকে ‘লেজকাটা বেড়ালের শহর’ নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ অদ্ভুত নামটি কৌতুকবহু নয় কি? লেজকাটা বেড়ালের গল্পটি এ রকম :

গ্যাব্রোভো শহরে শীতের দিনে বাজার থেকে কয়লা কিনে ফায়ারপ্লেসে জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখতে হয়। এতে খরচের অঙ্ক খুব কম হয় না। একদিন এক গ্যাব্রোভোবাসী ভাবল, তার এ খরচ কমাতে হবে। কী করে তা করা যায়, তাই উদ্ভাবন করল সে।

তার একটা আদুরে বেড়াল ছিল। এর লেজটি ছিল বেশ মোটা ও অনেক লম্বা। বেড়ালটিকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখাত। আর বাড়িতে সবাই আদর-যত্ন করত।

শীত আসার আগেই লোকটি এক দিন তার আদুরে বেড়ালের লেজ হঠাৎ কেটে দিল। সবাই চৈতন্যে উঠল : ‘সর্বনাশ! এ কী করলে’? লোকটি বলল, ‘উদ্ভিগ্ন হওয়ার কারণ নেই, বেড়ালটিকে আমরা আদর করব ঠিকই। তবে, আসছে শীতে দরজা খুলে তাকে বাইরে নিতে আর ঘরে আনতে যে তাপটুকু নষ্ট হত, তার অর্ধেকটা এখন থেকে বেঁচে যাবে। এরপর থেকেই লেজকাটা বেড়াল, গ্যাব্রোভোতে মিতব্যয়িতার তথা কাপণ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে গ্যাব্রোভোবাসীদের কৃপণতামর্মে মিতব্যয়িতার কাহিনী খতম নয়, বরং শুধুমাত্র তাদের মিতব্যয়িতার ব্যাপারটি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাও আঁচ করা যায় আর একটি খোশগল্পে। গল্পটি এরকম :

অনেক দিন আগের কথা।

এক ভদ্রলোক দূরদেশ থেকে গ্যাব্রোভোতে বেড়াতে এসে দেখলেন, এখানকার লোকজন মরা মানুষকে শুইয়ে কবর দেয় না, খাড়া দাঁড় করিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলে।

ভদ্রলোকটির কাছে ব্যাপারখানা কেমন কেমন ঠেকল। তিনি এক জনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কী কাণ্ড মশায়? এমনটি তো কোথাও দেখি না। আপনারা মরা মানুষকে শুইয়ে কবর না দিয়ে খাড়া করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন কেন?

লোকটি হাসিমুখে উত্তর দিলেন—আমরা মিতব্যয়ী কিনা, তাই শুইয়ে কবর দিয়ে জমির অপচয় করিনে।

এটি গ্যাব্রোভোবাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাদের চরিত্রে এ বৈশিষ্ট্যের যে কতরকম অভিব্যক্তি ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই! কয়েকটি প্রচলিত বৈশিষ্ট্য এরকম :

- ১। তারা যখন মাছ খায়, মাছের কাঁটাগুলো জমা করে রাখে—যাতে ভবিষ্যতে ওগুলোকে দাঁতের খিলাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ২। ঘড়ির চাকা তাড়াতাড়ি যাতে না ক্ষয়ে যায় এইজন্য রাতের বেলায় তারা ঘড়ি বন্ধ করে রাখে।
- ৩। বেচাকেনার জন্য তারা গ্যাব্রোভো থেকে সোফিয়া শহরে এলে উষ্ণ প্রস্রবণের পানি খেয়ে সকালবেলার চা খরচটা বাঁচিয়ে দেয়।
- ৪। তারা দেশলাইয়ের একটি কাঠিকে চিরে দু ভাগ করে নিয়ে সিগারেট জ্বালায়, যেন এক কাঠিতে দু বার আগুন জ্বালানো যায়।
- ৫। তারা বাজার থেকে জিনিস কেনার সময় তা সেদিনকার খবরের কাগজে মুড়িয়ে পেতে চায়, যেন খবর পড়ার জন্য ঐদিনের কাগজটি আর কিনতে না হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হল : গ্যাব্রোভোবাসীরা অপরকে হাসায় এবং নিজেরাও হাসে। তারা নিজেদের সম্মানের ক্ষতি করেও অন্যের হাস্য-পরিহাসের বস্তুতে পরিণত হতে ভালোবাসে। তাদের চরিত্রের এই বিশেষত্ব তাদেরকে সত্যিই মজার মানুষ করে তুলেছে।

শব্দার্থ

খতম	-	শেষ।
অভিব্যক্তি	-	ভালোভাবে প্রকাশ।
উদ্বিগ্ন	-	উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত।
কার্পণ্য	-	কৃপণতা, কিপটেমি।
কৃপণতামর্ষী	-	কিপটেমির ঝোঁকবিশিষ্ট।
শিল্পচর্চা	-	চারু ও কারুকলা অনুশীলন।
বোলচাল	-	কথাবার্তা ও আচার-আচরণ।
মিতব্যয়িতা	-	পরিমিত ব্যয় করার অভ্যাস।
হাস্য-পরিহাস	-	হাসি-ঠাট্টা, রস-রসিকতা।
খোশগল্প	-	আমোদজনক আলাপ, মজার কাহিনী।
সংস্কৃতিসেবী	-	যিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন।
উদ্ভাবন	-	এমন কিছু আবিষ্কার যা ছিল না বা নেই।
ফায়ারপ্লেস	-	শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখার জন্যে আগুন জ্বালানোর জায়গা।

পাঠ-পরিচিতি

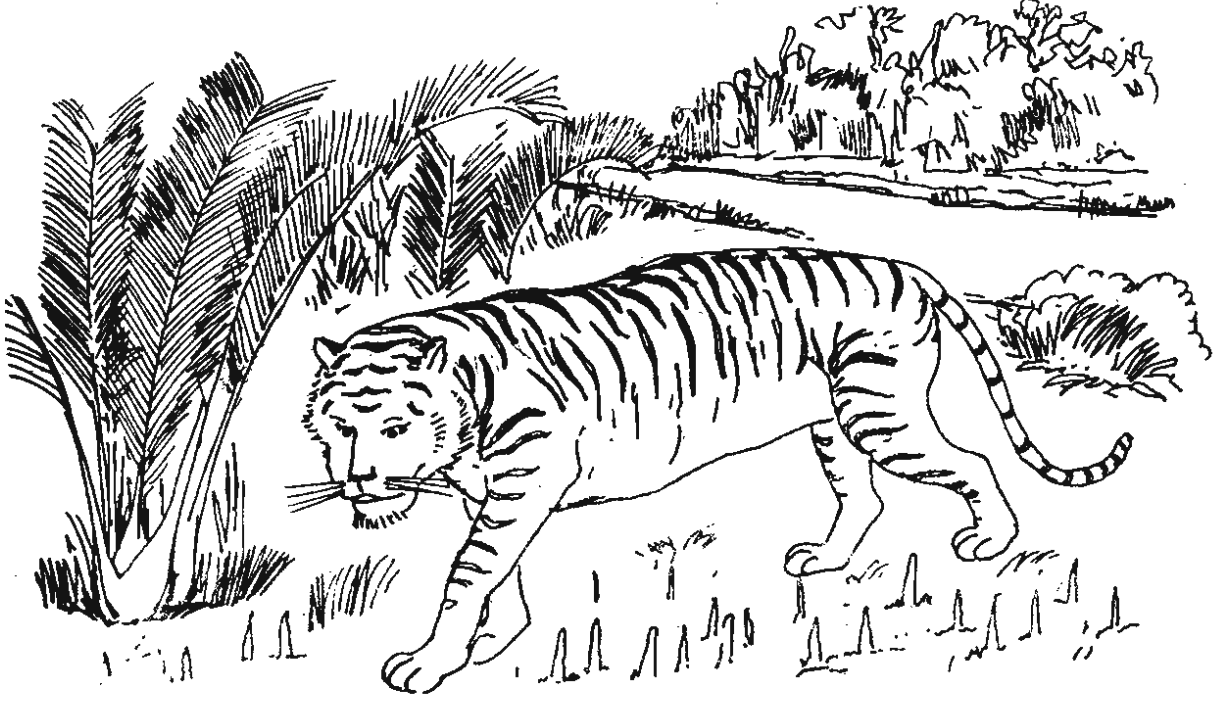
পৃথিবীর নানা দেশে রয়েছে নানা জাতি। বিচিত্র তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি। দেশভ্রমণে গেলে জানা যায় তাদের সম্পর্কে, তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। কিন্তু সবার পক্ষে তো আর দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখা সম্ভব হয় না। তাই কেউ যদি দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করেন তবে সেসব লেখা পড়েও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি।

গবেষক ও পণ্ডিত ডক্টর এনামুল হক ১৯৭৫ সালে গিয়েছিলেন বুলগেরিয়ায়। সেখানকার ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে তাঁর লেখা ‘বুলগেরিয়া ভ্রমণ’ বইতে। ঐ গ্রন্থেই তিনি বর্ণনা করেছেন সেখানকার গ্যাব্রোভো অঞ্চলের অধিবাসীদের হাসি-খুশি, রঙ্গা-রসাত্মক জীবনচরণের আকর্ষণীয় দিকটির কথা। কেন তাদের শহরটির প্রতীক একটি লেজকাটা বিড়াল, তার কাহিনী তো আছেই, সে সঙ্গে তাদের মিতব্যয়িতা নিয়ে নানা খোশগল্পের সমাহার ঘটেছে এই রচনায়।

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর সমস্ত কর্মজীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, গবেষণার নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। সেকালের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদানকে তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। তিনি সরকারি চট্টগ্রাম কলেজ ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ও জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। কর্মজীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমৃত্যু তিনি ছিলেন জ্ঞানসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তিনি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘মুসলিম বাঙালা সাহিত্য’ ও ‘বঙ্গে সুফী প্রভাব’। ‘বুলগেরিয়া ভ্রমণ’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন তাঁর বুলগেরিয়া ভ্রমণের চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা।

মুহম্মদ এনামুল হক ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁর কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে।



জানা-অজানার সুন্দরবন

এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি সুন্দরবন। নিবিড় ঘন, চিরসবুজ এবং নিস্তব্ধ এই ‘সুন্দরবন’। সর্বত্র সবুজের রাজত্ব। গাছপালা অপরূপ সবুজ সাজে সজ্জিত। উপমহাদেশে সুন্দরবনের মতো বড় অরণ্যসংকুল বন আর নেই। এরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ জঙ্গলও কোথাও দেখা যায় না।

আমাদের সুন্দরবন বাস্তবিকই মনোরম। দুর্গম স্থাপদসংকুল এ জঙ্গল। বাঘের ভয়াল গর্জন, হিংস্র সাপের বিষাক্ত ফণা বিস্তার, কুমিরের তীক্ষ্ণ দাঁতাল মুখব্যাদান, হরিণের আর্তনাদ, মানুষের আনন্দ ও অসহায়তা এবং নীরব নিখর সুন্দরবনের কথা মনে করে হৃদয় শিউরে না উঠে পারে না।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু সুন্দরবনে নদীনালায় আধিক্য আরও বেশি। এখানকার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলভাগ। এই জলভাগই সুন্দরবনের প্রাণ। সুন্দরবনের সমস্ত নদীই সাগরমুখী। নদী যতই দক্ষিণে গিয়েছে ততই প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়েছে এবং কত যে শাখা বিস্তার করতে করতে অগ্রসর হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নদীনালা ও খালগুলো যেন সুন্দরবনের সর্বত্র জাল বিস্তার করে রয়েছে।

যে-কোনো নদীর শেষপ্রান্ত বা ত্রিমোহনায় পৌঁছালে বনের অপূর্ব শোভা উপভোগ করা যায়। মাঝে মাঝে চর বা দ্বীপ চোখে পড়ে। কোথাও দেখা যায় বানরেরা দলবদ্ধ হয়ে খেলা ও কৌতুক করছে। এরা কোথাও ডালে ডালে নেচে বেড়ায়। গাছের ডাল, ফল, পাতা ভেঙে হরিণের দলকে ডেকে আনে এবং তাদেরকে খেতে দেয়। হরিণের সঙ্গে বানরের খুবই মিতালি। বাঘ এলে বানর হরিণকে সরে যাওয়ার জন্যে সংকেতধ্বনি করে।

কখনও আবার বানর হরিণের পিঠে চড়ে আনন্দ পায়। সুন্দরবনে প্রায় সব জীবজন্তুর দেখা মেলে। কিন্তু বাঘের দেখা পাওয়া সহজ হয় না।

সুন্দরবনের হরিণ এক অমূল্য সম্পদ। তারা দলে দলে বনানীর পাশে খোলা মাঠে চরে বেড়ায়। দূর থেকে ডাক দিলে মাথা উঁচু করে তাকায়। কিন্তু শিকারি দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। হরিণের দৃষ্টি প্রখর, গতি ক্ষিপ্ত। সুন্দরবনে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এই সমস্ত দ্বীপের জঙ্গল গভীর এবং তাতে প্রচুর হরিণ থাকে। তাড়া পেলে দলে দলে হরিণ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ক্ষিপ্তগতিতে অন্য তীরে বা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুন্দরবনের মধ্যে নদীবেষ্টিত এই দ্বীপগুলোর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুলবার নয়।

সুন্দরবনের আরম্ভ থেকে বজোপসাগরের তীর পর্যন্ত মনোরম দৃশ্য। সে দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। পাঠাকাটার জঙ্গলে বাঘের আড্ডা খুব বেশি। আর সাতক্ষীরা রেঞ্জের সুবদিতে পাখিদের এক বিরাট আড্ডা। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ পাখি এখানে আশ্রয় নেয়। গাছে গাছে অসংখ্য বাসা বেঁধে পাখিরা এখানে বসবাস করে। এখানকার পাখির মধ্যে শামুখোল, বক, বিলবাবুজ ও বাঁশিচোরা পাখির সংখ্যাই বেশি। ভীমরাজ, কাক, পানকৌড়িও দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে এখানে পাখির বসবাস হ্রাস পেয়েছে।

সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী জমিতে প্রচুর ধান ফলে। এখানকার জমি উর্বর। লবণাক্ত ও সুমিষ্ট পানির সখিমিশ্রণে ধান সবচেয়ে ভালো হয়। এমন এক মনোরম জায়গায় শরৎকালে ধানের আবাদ দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘আমার জন্মভূমি’ লিখেছিলেন। কবিতার কয়েকটি লাইন এরকম :

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।

পৃথিবীর অন্য কোথাও সুন্দরবনের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃক্ষলতা নেই। সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ সুন্দরী। এর কাঠে মজবুত তক্তা হয় এবং নৌকা ও ঘরের দরজা জানালা তৈরি করা হয়ে থাকে। সুন্দরী কাঠের নৌকা এদেশে প্রসিদ্ধ।

সুন্দরীর পরই কেওড়ার স্থান। এর তক্তা দিয়ে গ্রামের লোকেরা ঘরের বেড়া, দরজা, জানালা তৈরি করে। গ্রামের লোকেরা এই কাঠ দিয়ে আসবাবপত্রও তৈরি করে থাকে।

সুন্দরবনের সবচেয়ে দামি কাঠ পশুর। স্থায়িত্বের দিক থেকে এই কাঠ বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। এর বাকল দিয়ে মূল্যবান রং তৈরি হয়। এর তক্তাও মূল্যবান।

গেউয়া গাছ সুন্দরবনের আর্থিক সম্পদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর খোল তৈরি হয়। গেউয়া কাঠ থেকে কাগজ তৈরি হয়। এই কাগজ দেশে-বিদেশে ‘নিউজপ্রিন্ট’ হিসেবে সংবাদপত্রের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশলাইয়ের কাঠি ও পেলিলের কাঠ পাওয়া যায় গেউয়া ও ধুন্দুল গাছ থেকে। বাইন গাছের তক্তা বেশ প্রশস্ত হয় বলে তা দিয়ে গৃহস্থের বাজ্র, পিড়ি, আলমারি, টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্র তৈরি হয়। বাইন গাছে ধানভানা টেকি তৈরি হয়ে থাকে। গরান কাঠ ঘরের খুঁটি, নৌকা চালানোর লগি, হুকুর নলচে ইত্যাদি তৈরিতে কাজে লাগে। গর্জন গাছ থেকে তেল হয়, কাঠ তো আছেই।

সুন্দরবনের গোল গাছ মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। গোলপাতা দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ ঘরের ছাউনি হয়ে থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে গোলপাতার মতো হোগলাও খুবই উপকারী। হোগলা দিয়ে পাটি, নৌকার ও ঘরের ছাউনি, কৃষকের মাথাল, বাড়িঘরের বেড়া ইত্যাদি তৈরি হয়।

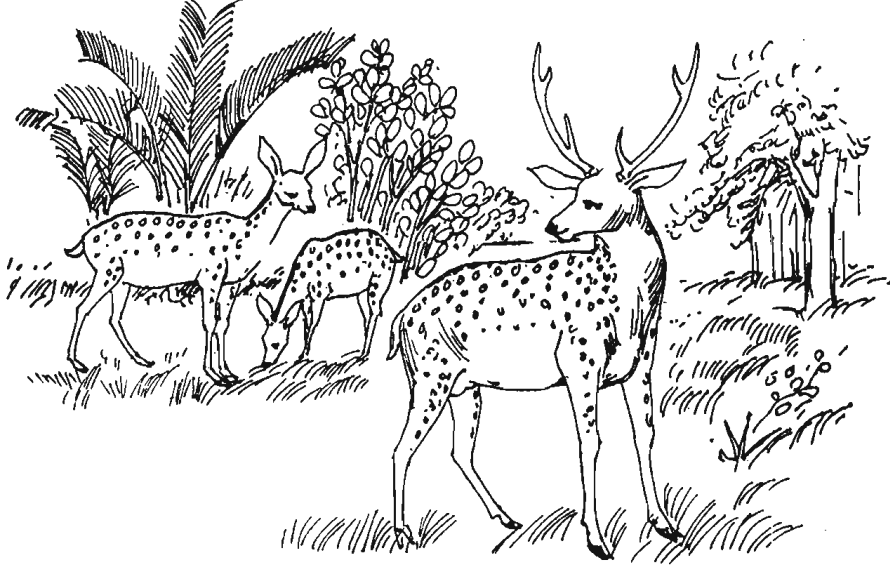
সুন্দরবনের বনজ সম্পদ আমাদের দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সুন্দরবনের কাঠ দিয়ে অসংখ্য গৃহস্থের জ্বালানি হয়। কাঁচা ইট পুড়িয়ে পাকা করতেও এ জ্বালানি কাজে লাগে। চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাজ্র ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরিতেও লাগে সুন্দরবনের কাঠ। কাঠ দিয়ে নৌকা এবং সাঁকো নির্মাণ করা হয়। কাঠ বৈদ্যুতিক খুঁটি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চারুপাঠ

সুন্দরবনের খলসি ও গেউয়া ফুলে প্রচুর মধু থাকে। মৌমাছির দল অসংখ্য মৌচাক তৈরি করে তাতে মধু সংগ্রহ করে। মধু সুন্দরবনের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সুন্দরবনের আশেপাশের গ্রাম থেকে মৌয়ালিরা বসন্ত ও গ্রীষ্মের মণ্ডসুমে দলে দলে বনের ভেতর গিয়ে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে।

সুন্দরবন তাই শুধু রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি নয়, বহু অমূল্য সম্পদেরও আধার।

[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত।



শব্দার্থ

আবাসভূমি - বাসস্থান, বসবাস করার জায়গা।

নিবিড় - ঘন, দুর্ভেদ্য, গভীর।

নিস্তত্ব - (নিঃ+স্তত্ব) নীরব,
পুরোপুরি শব্দহীন।

অরণ্যসংকুল - জঙ্গলে ভরা, বন-বনানীতে
পরিপূর্ণ।

দুর্গম - যেখানে অনেক কষ্টে যেতে হয়।

স্বাপদসংকুল - হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ।

গর্জন - গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

মুখব্যাদান - হা করা, বিকটভাবে মুখ খোলা।

নিথর - স্থির, সন্দনহীন।

ইয়ত্তা - পরিমাণ, হিসাব, সীমা।

ত্রিমোহনা - তিন মোহনা মিলেছে যেখানে।

সংকেতসূচক - ইশারা বা ইঙ্গিত বোঝায় এমন।

ক্ষিপ্ৰগতি - দ্রুতগতি বা বেগযুক্ত।

আধার - আশ্রয়স্থল, কিছু থাকতে পারে
এমন জায়গা।

মৌয়ালি - মধুসংগ্রহকারী।

পাঠ-পরিচিতি

‘জলে কুমির ডাজ্জায় বাঘ’—এই প্রবাদটির জন্ম বোধ হয় সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে। কারণ এই বনের জঙ্গলে বিচরণ করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর জলে আছে মানুষখেকো কুমির। কিন্তু সুন্দরবনে যে কেবল কুমির আর বাঘ আছে তাই নয়। আছে বানর, হরিণ, অসংখ্য পাখিপাখালি। আছে আবাদযোগ্য উর্বর ফসলি জমি। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানকার জঙ্গলে বনজ সম্পদের যে বিশাল ভান্ডার রয়েছে সেটি। এই সম্পদ যে কেবল গৃহস্থঘরের ও ইটের ভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা নয়, নানারকম আসবাবপত্র, নৌকা, সাঁকো তৈরির কাঠ আসে সুন্দরবন থেকে। ঘরের বেড়া, কড়ি-বর্গা, বাস, লঞ্চ ইত্যাদি তৈরিতেও কাজে লাগে এখানকার কাঠ। খুলনা কাগজের কলে কাগজ তৈরিতেও সুন্দরবনের কাঠের দরকার পড়ে। আর গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া হয় আশেপাশের অঞ্চলের বাড়িঘরের চাল। সুন্দরবন বনজ মধুরও প্রধান উৎস।

‘জানা অজানার সুন্দরবন’ রচনাটিতে সুন্দরবনের জীব-পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। রচনাটি লেখকের ‘সুন্দরবনের ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত করে সংকলিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

কর্মজীবনে আইনজীবী হলেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, রাজনীতি সব বিষয়ে সমান উৎসাহী ছিলেন এ.এফ.এম. আবদুল জলীল। প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসকার হিসেবে ১৯৭৬ সালে ‘সুন্দরবনের ইতিহাস’ নামে তিনখন্ডের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস লিখে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘ইবনে খালদুন’, ‘ইরানের বুলবুল’, ‘মুসলিম সংস্কৃতি’, ‘আমার কথা’, ‘পারস্য সাহিত্য’, ‘পাঁচ হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালি’। সাহিত্য ও ইতিহাস সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ‘বাংলা একাডেমী বিশেষ পুরস্কার’ ও ‘ইতিহাস পরিষদ পুরস্কারে’ ভূষিত হয়েছেন।

এ.এফ.এম. আবদুল জলীলের জন্ম খুলনার পানতিতা গ্রামে ১৯১৬ সালে। ১৯৭৮ সালের ২রা নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সুন্দরবনাঞ্চলের কতটুকু অংশ জলভাগ ?

ক. এক-তৃতীয়াংশ

খ. এক-চতুর্থাংশ

গ. এক-পঞ্চমাংশ

ঘ. এক-ষষ্ঠাংশ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২, ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

উপমহাদেশে সুন্দরবনের মতো অরণ্যসংকুল বন আর নেই। একই সঙ্গে বলা যায় এ বন দুর্গম এবং স্থাপদসংকুলও বটে। এখানে ‘জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ’। আরও আছে বিষাক্ত সাপ এবং হিংস্র সব জীবজন্তুর ভয়ংকর সমাবেশ। দেখে আনন্দ ও কৌতুক জন্মায় এমন সব পশু পাখি ও আছে। যেমন বানর, হরিণ, পানকৌড়ি, বক আর নাম-না-জানা পাখিপাখালি।

২. সুন্দরবনকে ‘স্থাপদসংকুল’ কেন বলা হয়েছে ?

ক. এখানে অসংখ্য সাপ আছে

খ. এখানে পাখিপাখালি আছে

গ. এখানে জীবজন্তু আছে

ঘ. এখানে হিংস্র জীবজন্তু আছে

৩. ‘জলে কুমির ডাঙায় বাঘ’ এটি একটি—

ক. প্রবাদ

খ. বাগধারা

গ. জনশ্রুতি

ঘ. কবিতার চরণ

৪. ‘এখানে অসংখ্য পাখির আবাস’। —এর কারণ

ক. এ বন স্থাপদসংকুল

খ. এ বন অরণ্যসংকুল

গ. এ বনে বাঘ আছে

ঘ. এ বনে বনে হরিণ আছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

যে কোনো নদীর শেষ প্রান্ত বা ত্রিমোহনায় পৌঁছালে বনের অপূর্ব শোভা উপভোগ করা যায়। মাঝে মাঝে চর বা দ্বীপ চোখে পড়ে। কোথাও দেখা যায় বানরেরা দলবন্দ্য হয়ে খেলা ও কৌতুক করছে। এরা কোথাও ডালে ডালে নেচে বেড়াচ্ছে। গাছের ডাল, ফল, পাতা ভেঙে হরিণের দলকে ডেকে আনে এবং তাদেরকে খেতে দেয়। হরিণের সঙ্গে বানরের খুবই মিতালি। বাঘ এলে বানর হরিণকে সরে যাওয়ার জন্যে সংকেতধ্বনি করে।

[... সুন্দরবনের হরিণ এক অমূল্য সম্পদ। তারা দলে দলে বনানীর পাশে খোলা মাঠে চরে বেড়ায়। দূর থেকে ডাক দিলে মাথা উঁচু করে তাকায়। কিন্তু শিকারি দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। হরিণের দৃষ্টি প্রখর, গতি ক্ষিপ্র।

- ক. উদ্ভূতশক্তি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
- খ. ‘বাঘ এলে বানর হরিণকে সরে যাওয়ার জন্যে সংকেতধ্বনি করে।’ –এর কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্ভূতশক্তির আলোকে বানর ও হরিণের স্বভাবগত পার্থক্য লেখ।
- ঘ. উদ্ভূতশক্তির আলোকে সুন্দরবনের অপরূপ সৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

স্কুল ছুটি। মনসুর মামার সাথে সুন্দরবন বেড়াতে এসেছে। বাবার কাছে শুনেছে, সুন্দরবন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। এখানে প্রায় সবরকম জীবজন্তুর দেখা পাওয়া যায়। বানরেরা নাকি এখানে হরিণের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ওরা যখন নদীর শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছাল তখন শব্দ পেয়ে পানকৌড়ির ঝাঁক ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। মনসুর চিৎকার করে বলল, ‘বাহ কী সুন্দর’। মামা বললেন: আরো অনেক পাখি আছে সুন্দরবনে যেমন, বিলবাবুচ, বাঁশিচোরা, ভীমরাজ, শামুখোল, বক ইত্যাদি মনসুর অজানাকে জানার আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠল।

- ক. সুন্দরবন কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
- খ. সুন্দরবনকে দেখার জন্য মনসুর আনন্দ অনুভব করে কেন?
- গ. উদ্ভূতশক্তির আলোকে সুন্দরবনে বিচরণকারী পশুপাখির একটি বিবরণ দাও।
- ঘ. মনসুরের সুন্দরবন দেখার কৌতূহলের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পৃথিবীর কোথাও সুন্দরবনের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃক্ষলতা নেই। ‘সুন্দরী’ এ বনের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ। মজবুত তক্তা, নৌকা ও ঘরের জানালা তৈরি হয় সুন্দরী কাঠ দিয়ে। ‘কেওড়া’ দিয়ে হয় ঘরের বেড়া, দরজা, জানালা। ‘পশুর’ হচ্ছে দামি কাঠ। এ দিয়ে হয় আসবাবপত্র, তার বাকল দিয়ে হয় রং। ‘গেওয়া’ গাছের গুঁড়ি থেকে হয় ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয় কাগজও হয় এ কাঠ দিয়ে। দেশলাইয়ের কাঠ আসে গেওয়া, ধুন্দুল গাছ থেকে। বাইনগাছে টেঁকি হয় ‘গরান’ কাঠে হয় নৌকার লগি ও হুঁকার নল, গোলপাতায় ঘরের ছাউনি হতে পারে। গর্জন কাঠ তো কাজে লাগেই। এ ছাড়াও এ কাঠ থেকে তেলও হয়। সুন্দরবনের গাছগুলো আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

- ক. উদ্ভূতশক্তি কয়টি গাছের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
- খ. সুন্দরবনের বৃক্ষলতাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ বলা হয়েছে কেন?
- গ. সুন্দরবনের কোন গাছকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে ভূমি বসবাসের উপযোগী সুন্দর একটি বাড়ি বানাতে পারবে, বর্ণনা দাও।
- ঘ. আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অবদান বিশ্লেষণ কর।

চারুপাঠ

শব্দার্থ

- গুঞ্জন - গুনগুন শব্দ।
নাশিতে - দূর করতে।
গৌরব - মর্যাদা, সম্মান, মহিমা।
সুমধুর - খুব মধুর, অত্যন্ত মনোহর।

পাঠ-পরিচিতি

মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি কবির অসামান্য মমতা ফুটে উঠেছে এই কবিতায়।

জীবনে যত কথা যত সুর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুমধুর হচ্ছে ‘মাগো’ কথাটি।

বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই দেশের মাটিতে, ফসলের মাঠে, শ্রমের ক্লাস্তি দূর করার জন্য কৃষাণের কণ্ঠে যে গান ভেসে ওঠে, সে গান মুক্ত আকাশে মুক্ত মনের গান। কবি এই প্রিয় মাতৃভূমির কোলে জন্ম নিয়েছেন। এই বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বাংলাভাষার মমতার আশ্রয়ে তিনি বেঁচে থাকতে চান এবং মৃত্যুর পর এই মাটিতেই শেষ আশ্রয় চান।

কবির মতো বাংলাদেশের অজস্র সন্তানও এ মাটির স্পর্শ নিয়েই গড়ে উঠতে এবং বিশ্বসভায় বড় মাপের মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়।

কবি-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে তাঁর মাতুলালয়ে।

যে-সময় সুফিয়া কামালের জন্ম সে-সময় বাংলার মুসলমান মেয়েদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন। মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়তে দেওয়া হত না, ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হত না। উচ্চশিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। তখন মেয়েদের জীবন কাটত গৃহের চার দেয়ালের অবরোধের মধ্যে। বেগম রোকেয়ার মতো সুফিয়া কামালও মেয়েদের জীবনের সে গ্লানিকে বইতে রাজি হননি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি তিনি, কিন্তু স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। কবিতা লিখে অগ্রগণ্য কবি হিসেবে তিনি এদেশে বরণীয় হয়েছেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনেও সোচ্চার ছিলেন। নিজেকে নিয়োজিত করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে, মানবকল্যাণে।

সুফিয়া কামাল বড়দের জন্য গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি বেশকিছু গ্রন্থ লিখেছেন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘ইতল বিতল’, ‘নওল কিশোরের দরবারে’।

তিনি অনেকগুলো পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে : ‘বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পুরস্কার’, ‘বাংলা একাডেমী পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ‘মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক’, ‘মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার’। কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

জন্মেছি এই দেশে

সুফিয়া কামাল

অনেক কথার গুঞ্জন শুনি
অনেক গানের সুর
সবচেয়ে ভালো লাগে যে আমার
'মাগো' ডাক সুমধুর।

আমার দেশের মাঠের মাটিতে
কৃষাণ দুপুরবেলা
ক্রান্তি নাশিতে কণ্ঠে যে তার
সুর লয়ে করে খেলা।

মুক্ত আকাশে মুক্ত মনের
সেই গান চলে ভেসে
জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে
মরি যেন এই দেশে।

এই বাংলার আকাশ-বাতাস
এই বাংলার ভাষা
এই বাংলার নদী, গিরি-বনে
বাঁচিয়া মরিতে আশা।

শত সন্তান সাধ করে এর
ধূলি মাখি সারা গায়
বড় গৌরবে মাথা উঁচু করি
মানুষ হইতে চায়।



চারুপাঠ

শব্দার্থ

গুঞ্জন	-	গুনগুন শব্দ।
নাশিতে	-	দূর করতে।
গৌরব	-	মর্যাদা, সম্মান, মহিমা।
সুমধুর	-	খুব মধুর, অত্যন্ত মনোহর।

পাঠ-পরিচিতি

মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি কবির অসামান্য মমতা ফুটে উঠেছে এই কবিতায়।

জীবনে যত কথা যত সুর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুমধুর হচ্ছে ‘মাগো’ কথাটি।

বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই দেশের মাটিতে, ফসলের মাঠে, শ্রমের ক্লাস্তি দূর করার জন্য কৃষাণের কণ্ঠে যে গান ভেসে ওঠে, সে গান মুক্ত আকাশে মুক্ত মনের গান। কবি এই প্রিয় মাতৃভূমির কোলে জন্ম নিয়েছেন। এই বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বাংলাভাষার মমতার আশ্রয়ে তিনি বেঁচে থাকতে চান এবং মৃত্যুর পর এই মাটিতেই শেষ আশ্রয় চান।

কবির মতো বাংলাদেশের অজস্র সন্তানও এ মাটির স্পর্শ নিয়েই গড়ে উঠতে এবং বিশ্বসভায় বড় মাপের মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়।

কবি-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে তাঁর মাতুলালয়ে।

যে-সময় সুফিয়া কামালের জন্ম সে-সময় বাংলার মুসলমান মেয়েদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন। মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়তে দেওয়া হত না, ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হত না। উচ্চশিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। তখন মেয়েদের জীবন কাটত গৃহের চার দেয়ালের অবরোধের মধ্যে। বেগম রোকেয়ার মতো সুফিয়া কামালও মেয়েদের জীবনের সে গ্লানিকে বইতে রাজি হননি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি তিনি, কিন্তু স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। কবিতা লিখে অগ্রগণ্য কবি হিসেবে তিনি এদেশে বরণীয় হয়েছেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনেও সোচ্চার ছিলেন। নিজেকে নিয়োজিত করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে, মানবকল্যাণে।

সুফিয়া কামাল বড়দের জন্য গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি বেশকিছু গ্রন্থ লিখেছেন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘ইতল বিতল’, ‘নওল কিশোরের দরবারে’।

তিনি অনেকগুলো পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে : ‘বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পুরস্কার’, ‘বাংলা একাডেমী পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ‘মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক’, ‘মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার’। কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের দেশের কৃষকেরা তাদের ক্লান্তি দূর করতে দুপুরবেলা কী করে ?
ক. পান্তা পানি খায়
খ. চিঁড়ে মুড়ি খায়
গ. গল্পগুজব করে
ঘ. বিচিত্র সুরে গান গায়
২. কবির কাছে ‘মাগো’ ডাক সুমধুর লাগে। কারণ—
i. মা অতি আপনজন
ii. মাতৃভাষায় মধুর শব্দ
iii. মা ও মাতৃভাষা উভয়ই প্রিয়

কোন উত্তরটি সর্বোত্তম ?

- ক. i খ. i এবং ii
গ. iii ঘ. ii

উদ্ধৃত কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শত সন্তান সাধ করে এর
 ধূলি মাখি সারা গায়
 বড় গৌরবে মাথা উঁচু করি
 মানুষ হইতে চায়।

৩. কবিতাংশে প্রকাশ পেয়েছে-
ক. দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা
খ. দেশের মাটির প্রতি সুগভীর মমত্ব
গ. বাঙালি পরিচয়ে বড় হবার স্বপ্ন
ঘ. বিশ্বসভায় দেশকে তুলে ধরা
৪. সুফিয়া কামাল কোন শতকের কবি?
ক. অষ্টাদশ
খ. উনবিংশ
গ. বিংশ
ঘ. একবিংশ

ગુજનનીમ પ્રશ્ન

এই বাংলার আকাশ-বাতাস
এই বাংলার ভাষা
এই বাংলার নদী, গিরি-বনে
বাঁচিয়া মরিতে আশা ।

- ক. বাংলার আকাশে বাতাসে কোন গান ভেসে চলে ?
- খ. বাংলাভাষার প্রতি আমাদের দুর্বলতার কারণ কী ?
- গ. উল্লিখিত কবিতাংশে আমাদের জীবনের যে আশার কথা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর ।
- ঘ. বাংলাভাষার সমৃদ্ধির জন্য কী করা দরকার যুক্তিসহ উপস্থাপন কর ।

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন দেখিলাম উলজা সে ছেলে
খুলি-পৈরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদীতীরে তীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে প'ড়ে
দৌহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।



শব্দার্থ

উলঙ্গা	—	খালি গা, নগ্ন, ন্যাংটা।	বাঁটি দিল	—	ভাগ করে দিল।
ঢেলা	—	মাটির খণ্ড বা দলা।	সোহাগ	—	আদর।
ছাগবৎস	—	ছাগলছানা।	দৌঁহারে	—	দুইজনকে।
ঘটি	—	পানি রাখার জন্য এক ধরনের পাত্র।	ডোরে	—	বন্ধনে, বাঁধনে।
সহসা	—	হঠাৎ, আকস্মিক।	কক্ষে	—	কাঁখে, কোলে, ক্রোড়ে।
			ত্রাসে	—	ভয়ে।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতায় কবি প্রকৃতির কোলে এবং মানুষের স্নেহদৃষ্টির ছায়ায় মানবশিশু ও ছাগশিশুর মধ্যকার একান্ত নৈকট্যকে তুলে ধরেছেন।

তঁার মতে মানবশিশু আর পশুশিশু প্রকৃতির একেবারে কাছাকাছি থাকে। বিশেষ করে মানবশিশুর সঙ্গে ছাগশিশুর পার্থক্য খুব সামান্য হয়ে দাঁড়ায় যদি সহানুভূতিশীল মানুষ এদেরকে প্রীতি ও স্নেহের আশ্রয়ে কোলে তুলে নেয়। মানুষের হৃদয়ের গভীর সহানুভূতিতে মানবশিশু ও পশুশিশু দুইই সমান। স্নেহ-মমতা সমানভাবে বেঁটে দেওয়া তার পক্ষেই সম্ভব যার হৃদয় গভীর সহানুভূতিতে ভরা। তখন দুয়ের মধ্যে ভেদ ঘুচে যায়। স্নেহের পরিচয়ই হয়ে ওঠে বড় পরিচয়।

লেখক-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয়নি। সতের বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে পড়াও শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় তিনি একক অবদানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান—সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গানকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। সেগুলো সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্ররচনাবলির ২৭টি খণ্ডে। পরে আরও কয়েকটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য লেখা সংকলিত হয়েছে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কৈশোরক’ নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘাটে বসে দিদি কী করছিল?
 ক. কলসে জল ভরছিল
 গ. স্নান করছিল
 খ. ঘটি মাজছিল
 ঘ. থালা বাসন মাজছিল
২. পরিচয় কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন—
 i. প্রকৃতির কোলে সকলেই সমান
 ii. স্নেহের দৃষ্টিভঙ্গিতে সব সমান
 iii. সকল প্রাণীকে একই রূপে ভালোবাসা উচিত

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
 গ. ii
 খ. i এবং ii
 ঘ. iii

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩-৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
 দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।

৩. উদ্ভূতির পরের পঙ্ক্তি
 ক. পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে প'ড়ে,
 গ. দৌহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে
 খ. দিদি ঘাটে ঘটি ফেলে ছুটে চলে আসে
 ঘ. সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
৪. উদ্ভূতাংশে ফুটে উঠেছে দিদির
 ক. মানুষের প্রতি ভালোবাসা
 গ. ছাগশিশুর প্রতি ভালোবাসা
 খ. পশুর প্রতি ভালোভাসা
 ঘ. সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা
৫. উদ্ভূতাংশটুকু কোন ছন্দে রচিত?
 ক. মাত্রাবৃত্ত
 গ. অক্ষরবৃত্ত
 খ. অমিত্রাক্ষর
 ঘ. স্বরবৃত্ত

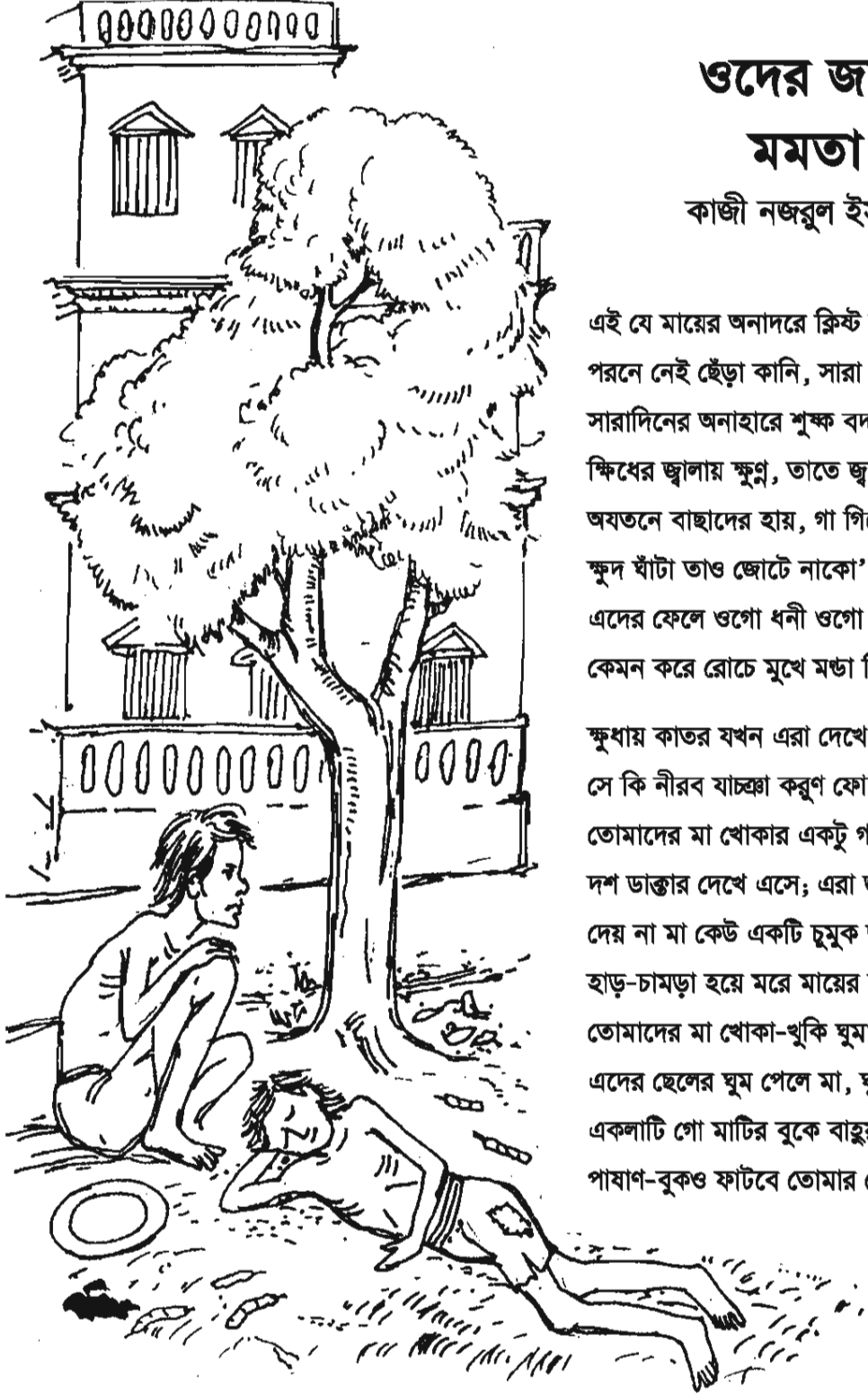
সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রকৃতির কোলে লালিত পশুশিশু এবং মানবকোলে লালিত মানবশিশুর প্রতি এক রমণীর সমবেদনা বা সমমমতা বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় কবিতায়। ছাগ এবং মানবশিশু প্রকৃতির খুবই কাছাকাছি। মানুষ যদি তার স্নেহ-ভালোবাসা, সহানুভূতি দ্বারা পরস্পরকে আবদ্ধ করতে পারে তবে ছাগশিশু ও মানবশিশুর ভিতরে তেমন পার্থক্য থাকেনা। জীবে দয়া করা ধর্মেরই অংশ।

জীবে প্রেম করে যেই জন
 সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

- ক. 'পরিচয়' কবিতায় কাদের পরিচয় করানো হয়েছে ?
- খ. মানবশিশু ও ছাগশিশুকে কী ভাবে একীভূত করা যায়— উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর।
- গ. 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' উদ্ভূতিটি 'পরিচয়' কবিতার সঙ্গে কোনদিক থেকে সম্পৃক্ত বর্ণনা কর।
- ঘ. 'জীবে দয়া করা ধর্মেরই অংশ'—তুমি কি এ কথার সঙ্গে একমত? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।



ওদের জন্য মমতা

কাজী নজরুল ইসলাম

এই যে মায়ের অনাদরে ক্রিষ্ট শিশুগুলি,
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি।
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি
ক্ষিধের জ্বালায় ক্ষুণ্ণ, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি।
অযতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে,
ক্ষুদ ঝাঁটা তাও জোটে নাকো' সারাটি দিন খেটে।
এদের ফেলে ওগো ধনী ওগো দেশের রাজা!
কেমন করে রোচে মুখে মন্ডা মিঠাই খাজা?

ক্ষুধায় কাতর যখন এরা দেখে তোমায় খেতে,
সে কি নীরব যাত্রা করুণ ফোটে নয়নেতে।
তোমাদের মা খোকার একটু গা-টি গরম হলে,
দশ ডাক্তার দেখে এসে; এরা জ্বরে মলে—
দেয় না মা কেউ একটি চুমুক জলও এদের মুখে
হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে।
তোমাদের মা খোকা-খুকি ঘুমায় দোলায় দুলে;
এদের ছেলের ঘুম পেলে মা, ঘুমায় তেঁতুলতলে।
একলাটি গো মাটির বুকে বাহুয় থুয়ে মাথা;
পাষণ-বুকও ফাটবে তোমার দেখ যদি মা তা।

[সংক্ষেপিত]

চারুপাঠ

শব্দার্থ

ক্লিষ্ট	—	দুঃখকষ্টে জর্জরিত।	ঘাঁটা	—	নানারকম সবজি দিয়ে রান্না তরকারি।
ধুকধুকানি	—	মৃদু হৃদস্পন্দন, মানসিক অস্থিরতা।	রোচে	—	ভালো লাগে।
শুষ্ক	—	শুকনো।	যাচফা	—	প্রার্থনা, যাচনা, চাওয়া।
বদন	—	মুখ, মুখমণ্ডল।	মলে	—	মরলে।
ক্ষুণ্ণ	—	অপরের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের জন্য দুঃখিত, ব্যথিত।	ধুঁকে	—	হাঁপিয়ে, ঘন ঘন নিশ্বাস টেনে।
কানি	—	ন্যাকড়া।	থুয়ে	—	রেখে।
			পাষণ	—	নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতায় অবহেলিত, অনাদৃত, অনাহারী দরিদ্র শিশুদের প্রতি কবির গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেশে এমন অনেক শিশু আছে যাদের শৈশব কাটে অনাদরে, অনাহারে, অযত্নে। তাদের পরনের কাপড় জোটে না, অসুখে চিকিৎসা মেলে না। শৈশবের আনন্দবঞ্চিত এসব শিশুকে সারাদিন খাটতে হয়। অথচ ওদের দিকে না তাকিয়ে সমাজের ধনীরা, শাসকরা নানা মুখরোচক খাবার খায়, নানা বিলাসিতায় সম্পদের অপচয় করে। ধনী মায়ের সন্তানের গা গরম হলে একের-পর-এক ডাক্তার আসে, কিন্তু গরিব মায়ের সন্তান মুখে সামান্য পানি তুলে দেবার সেবাটুকুও পায় না। ধনীর শিশু দোলনায় ঘুমায় আর গরিবশিশুকে ঘুমাতে হয় রাস্তায়, তেঁতুলতলায়। এদের দিকে সহানুভূতির চোখে তাকাতে হবে। সত্যিকারের মায়ের মন খাঁর আছে, তিনি এদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারেন না।

কবি-পরিচিতি

অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে যিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নন্দিত আসন পেয়েছেন তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, বুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

আরও বিস্ময়কর তাঁর সৃষ্টি—কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ইত্যাদি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই অভিনব। তিনি যে শুধু বড়দের জন্য অনেক গ্রন্থ লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্যও তিনি লিখেছেন অনেক কাব্য, গান, নাটক ও গল্প। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : ‘ঝিঙেফুল’, ‘পিলে পটকা’, ‘ঘুমজাগানো পাখি’, ‘ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি’ এবং নাটক হচ্ছে ‘পুতুলের বিয়ে’।

নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর লেখা গান ‘চল চল চল’ আমাদের রণসংগীত।

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, ঢাকায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘুম পেলে গরিব শিশু কোথায় ঘুমায় ?
 ক. তেঁতুলতলে
 গ. মায়ের বুকে
 খ. রাস্তায়
 ঘ. বিছানায়
২. পথশিশুদের শৈশব কাটে-
 i. অনাদরে
 ii. অনাহারে
 iii. খালি গায়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------|-------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. ii | ঘ. ii ও iii |

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

করিম ফুল বিক্রি করে তার মাকে সংসার খরচে সাহায্য করে। সারাদিন বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যালে সে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রোদ-বৃষ্টি-বাড় মাথায় নিয়ে সে প্রতিদিন সকালে ফুল বিক্রি করতে বের হয়। এতকিছুর পরেও দুবেলা খাবারের কোনো নিশ্চয়তা তার নেই।

৩. ‘ওদের জন্য মমতা’ কবিতায় করিমের জন্য প্রকাশ পেয়েছে কবির -
 i. গভীর সহানুভূতি
 ii. সাধারণ ভালোবাসা
 iii. গভীর অনুভূতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. করিমদের এই অনিশ্চিত জীবনের জন্য কবি কাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন ?
 ক. ধনী
 গ. প্রজা
 খ. গরিব
 ঘ. শিশু

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নোগুলোর উত্তর দাও।

রহিমের বাবা-মা ধনী। রহিম ধনীঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সে না-চাইতেই বহু কিছু পায়। সে নিত্যনতুন জামা পরে। তার বাবা-মা তার পছন্দের খাবার চাওয়া মাত্রই কিনে দেয়। একটু গা গরম হলেই তার বাবা-মা উদ্বেগ হয়ে ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে। অন্যদিকে রহিম একজন পথশিশু। দুবেলা অন্ন জুটে না ঠিকমতো। রোগেশোকে ভোগে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোনো সামর্থ্য নাই। জীবনের শুরু থেকেই তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

চারুপাঠ

- ক. ‘ওদের জন্য মমতা’ কবিতার দুটি লাইন উদ্ধৃত কর যেখানে গা গরমের কথা বলা হয়েছে।
- খ. উদ্ভূতাংশে সমাজের যে বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় দাও।
- গ. উদ্ভূতাংশে সমাজের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা কীভাবে দূর করা যায়-যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
- ঘ. সামাজিক বৈশিষ্ট্যের যে চিত্র উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

তোমাদের মা খোকার একটু গাটি গরম হলে,
দশ ডাক্তার দেখে এসে; এরা জ্বরে মলে—
দেয় না মা কেউ একটি চুমুক জলও এদের মুখে
হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে!
তোমাদের মা খোকা-খুকি ঘুমায় দোলায় দুলে;
এদের ছেলের ঘুম পেলে মা, ঘুমায় তেঁতুলতলে
একলাটি গো মাটির বুকে বাহুয় থুয়ে মাথা;
পাষণ-বুকও ফাটবে তোমার দেখ যদি মা তা!

- ক. ঘুম পেলে গরিব শিশু কোথায় ঘুমায়?
- খ. ‘হাড়- চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে। -চরণটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. ধনী ও গরিব শিশুর জীবনে কী ধরনের পার্থক্য তা উদ্ভূত কবিতাংশটি অবলম্বনে লিখ।
- ঘ. ‘পাষণ-বুকও ফাটবে তোমার দেখ যদি মা তা? -এ উদ্ভূতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

বাংলা ভাষা

জসীমউদ্দীন

আমার এমন মধুর বাংলা ভাষা
ভায়ের বোনের আদর মাথা।

মায়ের বুকের ভালোবাসা।

এই ভাষা - রামধনু চড়ে
সোনার স্বপন ছড়ায় তবে
যুগ-যুগান্ত পথটি ভরে

নিত্য তাদের যাওয়া আসা।

পূব বাংলার নদী থেকে
এনেছি এর সুর
শস্য দোলা বাতাস দেছে

কথা সুমধুর;

বস্ত্র এরে দেছে আলো
ঝঞ্ঝা এরে দোল দোলালো
পদ্মা হল সর্বনাশা।

বসনে এর রং মেখেছি
তাজা বুকের খুনে
বুলেটেরি ধূম্রজালে
ওড়না বিহার বুনে।

এ ভাষার-ই মান রাখিতে
হয় যদিবা জীবন দিতে
কোটি ভাইয়ের রক্ত দিয়ে
পুরাবে এর মনের আশা।

[সংক্ষিপ্ত]



চারুপাঠ

শব্দার্থ

রামধনু	—	রংধনু ।
স্বপ্ন	—	স্বপ্ন ।
যুগ-যুগান্ত	—	এক যুগ থেকে অন্য যুগ ।
নিত্য	—	সব সময় ।
বজ্র	—	বাজ ।
ঝঞ্ঝা	—	ঝড় ।
বসন	—	পরার কাপড়, বস্ত্র ।
ধূম্রজাল	—	ধোঁয়ার মতো জাল বিস্তার ।

বুলেটেরি ধূম্রজালে ওড়না বিহার বুনে — বুলেটের ধোঁয়া আন্দোলিত ওড়নার মতো আস্তরণ বুনেছে ।

পাঠ-পরিচিতি

এই কবিতায় কবি আমাদের জীবনে বাংলাভাষার মহিমার কথা বলেছেন ।

ভাইবোনের আদর ও মায়ের মমতা মাখা বলে বাংলাভাষা এত মধুর ।

এ ভাষা একদিনে গড়ে ওঠেনি । যুগ যুগ ধরে এ ভাষায় আমরা স্বপ্ন দেখেছি, কল্পনায় বিভোর হয়েছি । পূর্ববাংলার অর্থাৎ বাংলাদেশের নদী, মাঠ, প্রকৃতি ও জীবন থেকে এই ভাষা কথা ও সুর পেয়েছে । ১৯৫২ সালে বাঙালির বুকের রক্তে সমৃদ্ধ হয়েছে এ ভাষা ।

তাই বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষায় এবং আমাদের মনের আশা ও জাতির স্বপ্নসাধ পূরণ করতে আমরা জীবন দিতেও প্রস্তুত ।

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্দীনের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল ছাত্রজীবনে । তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই তাঁর ‘কবর’ কবিতাটি ‘প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের’ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল । তাঁর কবিতায় সহজ সরল ভাষায়, সাবলীল ছন্দে রূপ পেয়েছে গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ও জীবনের নানান ছবি ।

তাঁর বিখ্যাত ‘নঙ্গী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে । তাঁর কবিতাগুলো পনেরটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । এ ছাড়া তিনি স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, নাটক এবং প্রবন্ধও লিখেছেন । শিশুদের জন্য লেখা ‘ডালিমকুমার’ তাঁর অনবদ্য রচনা । এছাড়াও ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন : ‘হাসু’, ‘এক পয়সার বাঁশি’ ইত্যাদি কবিতাগ্রন্থ । কর্মজীবনের শুরুতে জসীমউদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন, পরে সরকারের প্রচার বিভাগে কাজ করেন । তিনি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে অনেক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন ।

কর্মকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে সম্মানিত করে ।

জসীমউদ্দীনের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি, ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে । তাঁর মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় (বাংলা পিডিয়া-৩য় খন্ড-পৃষ্ঠা নং ৪৯২) ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাতাস শব্দের প্রতিশব্দ-
ক. সমীরণ
খ. অবনী
গ. অরুণ
ঘ. সলিল
২. রামধনুচড়ে সোনার স্বপন ছাড়ায় কারা ?
ক. ভাষা-শহীদগণ
খ. রাজনীতিকগণ
গ. কৃষক-শ্রমিকগণ
ঘ. কবি-সাহিত্যিকগণ
৩. যুগ-যুগান্ত পথটি ভরে নিত্য কাদের যাওয়া-আসা ?
ক. শিল্পী-সাহিত্যিকদের
খ. ইতিহাসবিদদের
গ. স্বপ্ন-কল্পনার
ঘ. ভাষাবিদদের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে তার মাতৃভাষা অত্যন্ত আদরের। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ-ভাষার বোল আমাদের কাছে গানের সুরের মতো সুমধুর। মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এ ভাষার রংধনুর মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ ভাষা আমাদের কাছে একই সঙ্গে ভালোবাসার এবং গৌরবের।

- ক. এই অংশটুকু তোমার পাঠ্য কোন কবিতার সঙ্গে মিলে ?
- খ. ‘এ ভাষার বোল আমাদের কাছে গানের সুরের মতো সুমধুর’। তোমার পাঠ্য কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- গ. বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে স্থান পেতে হলে কী করা প্রয়োজন-যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
- ঘ. এ ভাষার মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা রংধনুর মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ- বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আমার এমন মধুর ভাষা
ভায়ের বোনের আদর মাখা
মায়ের বুকে ভালোবাসা।

এই ভাষা রামধনু চড়ে
সোনার স্বপন ছড়ায় ভবে
যুগ-যুগান্ত পথটি ভরে
নিত্য তাদের যাওয়া-আসা।

- ক. কবিতাংশটির কবি কে ?
- খ. কবি বাংলাভাষাকে ভাইয়ের বোনের আদর মাখা বলেছেন কেন ?
- গ. বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন ?
- ঘ. ‘যুগ-যুগান্ত পথটি ভরে। নিত্য তাদের যাওয়া-আসা’ –উদ্দীপকের এ অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

সুখ

কামিনী রায়

নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জুলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয় ?
বল ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে –
না-না-না মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে ।
কার্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া
সমর অজ্ঞান সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ
যে জিনিবে সুখ লভিবে সে-ই ।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও ।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার ।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে ।

শব্দার্থ

বিষাদময়	- দুঃখময়।	পরের কারণে	- অন্যের জন্য।
ছিন্ন	- ছেঁড়া।	স্বার্থ	- নিজের সুবিধা, ব্যক্তিগত লাভ।
বীণে	- বীণা, তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।	আপনার	- নিজের।
সৃজিলা	- সৃষ্টি করলেন।	বলি	- উৎসর্গ।
বিধি	- বিধাতা, প্রভু।	হৃদয়ভার	- মনের কষ্ট।
সমর	- যুদ্ধ, লড়াই, রণ।	বিস্রুত	- ব্যতিব্যস্ত।
অজ্ঞান	- আঙিনা, উঠান, প্রাঙ্গণ।	অবনী	- পৃথিবী, ধরা, জগৎ।
জিনিবে	- জয় করবে।		

পাঠ-পরিচিতি

আমরা সবাই জীবনে সুখী হতে চাই। কিন্তু কীভাবে জীবনে সুখ আসতে পারে, ‘সুখ’ কবিতায় কবি সে-সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে তুলে ধরেছেন।

জগতে যারা কেবল সুখ খোঁজেন তাঁরা জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে ভাবেন মানুষের জীবন নিরর্থক। এ ধারণা ভুল। জীবনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আরও বিস্তৃত, অনেক মহৎ। দুঃখ-যন্ত্রণা সয়ে, সকল সংকট মোকাবেলা করে জীবনসংগ্রামে সফলতার মাধ্যমেই অর্জিত হয় সুখ।

কিন্তু সমাজের অন্য সবার কথা ভুলে কেউ যদি কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, সে হয়ে যায় আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। আর সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষ প্রকৃত সুখী হতে পারে না।

পক্ষান্তরে অন্যকে আপন ভেবে, অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে প্রীতি, ভালোবাসা, সেবা ও কল্যাণের মাধ্যমে যে অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে যুক্ত করে এবং অন্যের দুঃখ-ব্যথা দূর করার জন্য প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করে সেই প্রকৃত সুখী।

বস্তুত মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক ত্যাগের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে মানবসমাজ। এ সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই অন্যকে বাদ দিয়ে এ সমাজে একলা বাঁচার কথা কেউ ভাবতে পারে না, সুখী হওয়া তো দূরের কথা।

কবি-পরিচিতি

প্রায় একশ বছর আগে এদেশে যে কজন মহিলাকবি সাহিত্যচর্চা করে গেছেন তাঁদের একজন হলেন কামিনী রায়। একসময় তিনি ‘জৈনৈক বঙ্গ মহিলা’ ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর কবিতা সহজ ও সরল। তাতে জীবনের মহৎ আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় ফুটে উঠেছে। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি ‘আলো ও ছায়া’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘নির্মাল্য’, ‘অশোক সংগীত’, ‘দীপ ও ধূপ’ ও ‘জীবন পথে’। কবিতা ছাড়াও কামিনী রায় গল্প, নাটক ও জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগন্নারীণী পদকে’ সম্মানিত হয়েছিলেন।

কামিনী রায়ের জন্ম ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) জেলার বাসন্ডা গ্রামে এবং মৃত্যু কলকাতায় ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি কামিনী রায় -এর ছদ্মনাম কী ?
ক. ভানুসিংহ ঠাকুর
খ. যাযাবর
গ. বনফুল
ঘ. জনৈক বঙ্গা মহিলা
২. কবির মতে মানবজন্ম সার্থক হয় কীভাবে ?
ক. স্বার্থপরতার মধ্য দিয়ে
খ. পরোপকারের মধ্য দিয়ে
গ. সমাজ সচেতনতার মধ্য দিয়ে
ঘ. শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে
৩. প্রকৃত সুখী সে-ই, যে -
i. নিজের স্বার্থকে বড় মনে করে না
ii. অপরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে
iii. অপরের উপর নির্ভরশীল হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়ভার।
আপনার লয়ে বিব্রত রহিতে,
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।
ক. হিত উপদেশমূলক এই কবিতাটির রচয়িতা কে ?
খ. 'সকলের তরে সকলে আমরা' -চরণটির অর্থ কী ?
গ. উদ্দীপক থেকে তুমি কী শিক্ষা গ্রহণ করেছ এবং তা কাজে লাগিয়ে তুমি কীভাবে সুখী হতে পারবে ?
ঘ. উদ্ভূতশব্দটুকুর মূলভাব বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জগতের প্রত্যেকটি মানুষই সুখী হতে চায়। কিন্তু অন্যকে বাদ দিয়ে জীবনে একলা সুখী হওয়া কখনও সম্ভব নয়। অন্যকে ভালোবেসে, অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, ভালোবাসা, সেবা ও কল্যাণের মাধ্যমে যে সুখ পাওয়া যায়; তা-ই প্রকৃত সুখ।

- ক. প্রতিটি মানুষের কোন আকাঙ্ক্ষাটি একরকম ?
- খ. জীবনে একা সুখী হওয়া সম্ভব নয় কেন ?
- গ. জীবন-আচরণের কোন কোন বিষয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত সুখী হতে পারে, -উদ্দীপকের আলোকে উপস্থাপন কর।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রকৃত সুখের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

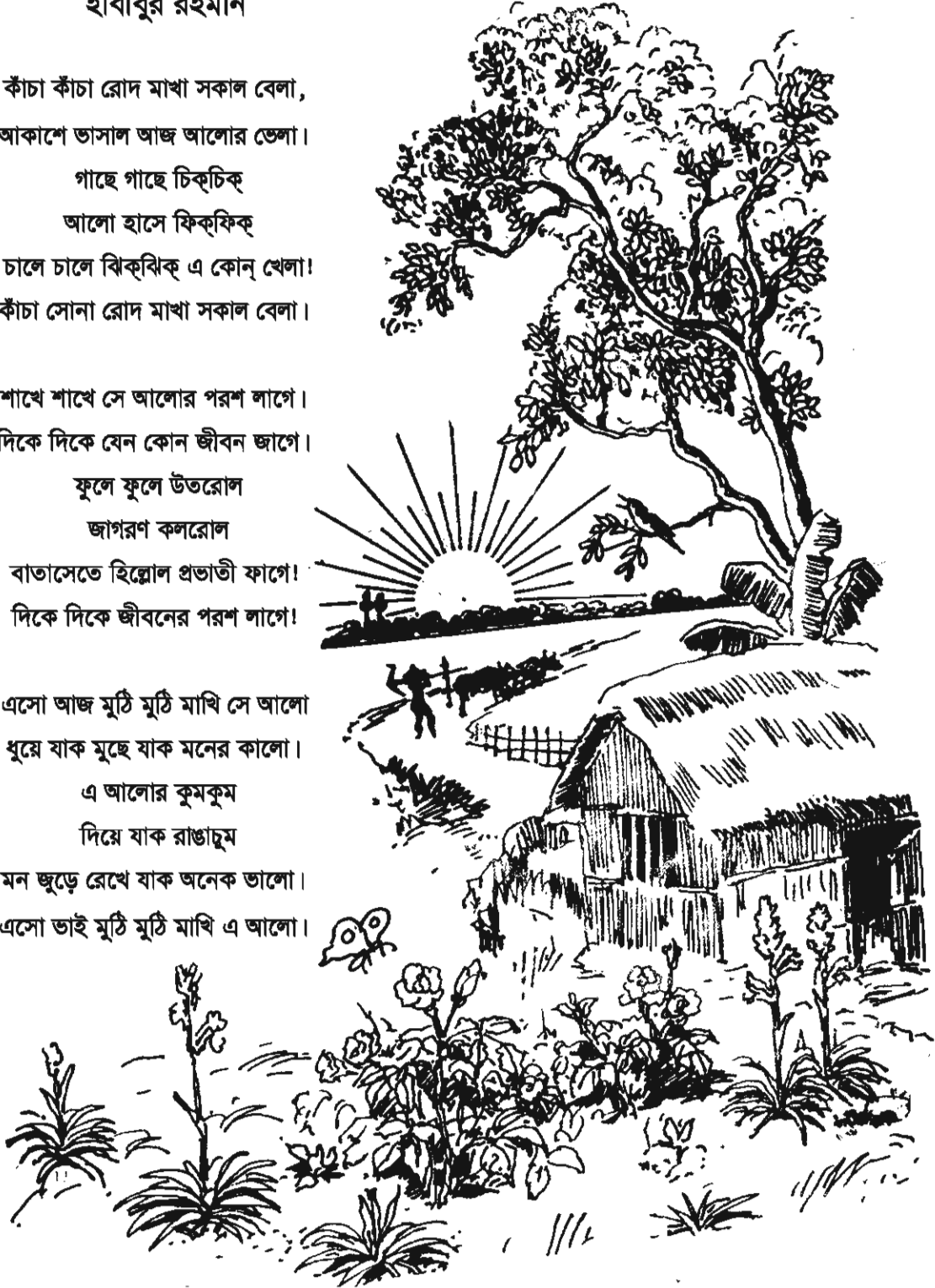
সকাল

হাবীবুর রহমান

কাঁচা কাঁচা রোদ মাখা সকাল বেলা,
 আকাশে ভাসাল আজ আলোর ভেলা।
 গাছে গাছে চিক্‌চিক্
 আলো হাসে ফিক্‌ফিক্
 চালে চালে ঝিক্‌ঝিক্ এ কোন্ খেলা!
 কাঁচা সোনা রোদ মাখা সকাল বেলা।

শাখে শাখে সে আলোর পরশ লাগে।
 দিকে দিকে যেন কোন জীবন জাগে।
 ফুলে ফুলে উতরোল
 জাগরণ কলরোল
 বাতাসেতে হিল্লোল প্রভাতী ফাগে!
 দিকে দিকে জীবনের পরশ লাগে!

এসো আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো
 ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের কালো।
 এ আলোর কুমকুম
 দিয়ে যাক রাঙাচুম
 মন জুড়ে রেখে যাক অনেক ভালো।
 এসো ভাই মুঠি মুঠি মাখি এ আলো।



চারুপাঠ

শব্দার্থ

ভেলা	– কলাগাছ, বাঁশ বা কাঠ ইত্যাদি একসঙ্গে বেঁধে পানিতে ভাসার উপযোগী তৈরি একধরনের জলযান।
পরশ	– স্পর্শ, ছোঁয়া।
উত্তরোল	– অশান্ততা, অস্থিরতা।
কলরোল	– কলকল ধ্বনি, কোলাহল।
হিল্লোল	– তরঙ্গ, ঢেউ, দোলা।
মনের কালো	– অন্তরের অপবিত্রতা বা কালিমা।
কুমকুম	– জাফরান, আবির ও সুবাসিত পানিতে পূর্ণ একধরনের গোলক।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটিতে রোদেলা সকালের অনুপম রূপলাবণ্যের ছবি আঁকা হয়েছে।

সোনারোদ-মাখা সকালে নীল আকাশ হয়ে ওঠে আলোয় আলোময়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে আলোর ঝিলিক। আলোর স্পর্শে পত্রপল্লব হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল, ফুলে ফুলে জাগে সাড়া। প্রকৃতিতে জাগে কর্মকোলাহল। চারদিক মুখর হয় জীবনের স্পন্দনে। আবির-রাঙা রোদের ছোঁয়ায় বাতাসে যেন লাগে দোলা।

কবি তারুণ্যকে আহ্বান জানান সেই আলোর সজীবতা দিয়ে মনের সমস্ত কালিমা মুছে ফেলতে। আহ্বান জানান, শূভ-সুন্দরের চেতনায় মনকে আলোকিত করতে।

কবি-পরিচিতি

হাবীবুর রহমান একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। দৈনিক সংবাদ-এর ছোটদের সাহিত্য-পাতা ‘খেলাঘর’-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। শিশু-কিশোরদের নানা সংগঠনের সঙ্গেও তিনি ছিলেন যুক্ত। হাবীবুর রহমানের জন্ম ১৯২২ সালের ১ জুলাই। ১৯৭৬ সালের ১৭ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক।

হাবীবুর রহমান শিশু-কিশোরদের জন্য অনেক বই লিখেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে ‘আগডুম বাগডুম’, ‘সাগরপারের রূপকথা’, ‘বিজন বনের রাজকন্যা’, ‘লেজ দিয়ে যায় চেনা’, ‘পুতুলের মিউজিয়াম’ ইত্যাদি।

‘সন্তডিজ্ঞা’ নামে একটি সংকলনও তিনি সম্পাদনা করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সকাল’ কবিতাটির কবি কে ?
ক. কামিনী রায়
খ. হাবীবুর রহমান
গ. আতোয়ার রহমান
ঘ. আবদুল কাদির
২. ‘কাঁচা সোনা রোদ মাখা সকাল বেলা’-এ চরণে ‘কাঁচা সোনা রোদ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
i. সকালের সোনালি বর্ণের কোমল রোদ
ii. সকালের সোনালি বর্ণের তীব্র রোদ
iii. সকালের সোনালি বর্ণের ছড়ানো রোদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চরণ দুটো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

এসো আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো
ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের কালো।

৩. কবি কাকে আলো মাখার আহ্বান জানিয়েছেন?

ক. ছাত্রদের

খ. তরুণদের

গ. কিশোরদের

ঘ. বয়োবৃদ্ধদের

৪. ‘মনের কালো’ দূর করা যায় কীভাবে?

i. আলোর স্পর্শে

ii. শুভ সুন্দরের চেনায়

iii. রোদের উষ্ণতায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতাংশটি পড় এবং এর আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কাঁচা কাঁচা রোদ মাখা সকাল বেলা,
আকাশে ভাসাল আজ আলোর ভেলা।
গাছে গাছে চিক্‌চিক্
আলো হাসে ফিক্‌ফিক্
চালে চালে ঝিক্‌ঝিক্ এ কোন খেলা!

ক. কবিতাংশে কোন সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

খ. কবিতাংশটিতে ‘আলোর ভেলা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. সকালবেলায় তোমার নিজ অনুভূতির একটি বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্ভূত্যাংশে প্রকৃতির যে স্বরূপ লক্ষ করা যায় তা বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সোনালি রোদ মাখা সকালের সৌন্দর্যের ছবি আঁকা হয়েছে ‘সকাল’ কবিতাটিতে। সকালের আলোর স্পর্শে গাছের পাতা নেচে ওঠে এবং ফুলে ফুলে সাড়া জাগে। চারদিক কোলাহলময় হয়ে ওঠে জীবন উৎসবে। কবি তরুণদের, সকালের আলো মেখে মনের কালিমা মুছে ফেলে জীবন স্পন্দনে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে-

এসো আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো
ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের কালো।

ক. ‘সকাল’ কবিতাটির কবি কে?

খ. ‘ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের কালো’-উদ্দীপকের এ অংশটি ব্যাখ্যা কর।

গ. ‘চারদিক কোলাহলময় হয়ে ওঠে জীবন উৎসবে, -প্রকৃতির এই জীবন-উৎসব ‘সকাল’ কবিতায় কীভাবে ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

ঘ. তোমার পঠিত ‘সকাল’ কবিতার আলোকে -উদ্ভূত্যাংশটুকু বিশ্লেষণ কর।

প্রিয় স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান



মেঘনা নদী দেব পাড়ি
কল-অলা এক নায়ে।
আবার আমি যাব আমার
পাড়াতলী গাঁয়ে।

গাছ-ঘেরা ঐ পুকুরপাড়ে
বসব বিকাল বেলা।
দু-চোখ ভরে দেখব কত
আলো-ছায়ার খেলা।

বাঁশবাগানে আধখানা চাঁদ
থাকবে বুলে একা।
ঝোপে ঝাড়ে বাতির মতো
জোনাক যাবে দেখা।

ধানের গন্ধ আনবে ডেকে
আমার ছেলেবেলা।
বসবে আবার দুচোখ জুড়ে
প্রজাপতির মেলা।

হঠাৎ আমি চমকে উঠি
হলদে পাখির ডাকে।
ইচ্ছে করে ছুটে বেড়াই
মেঘনা নদীর বাঁকে।

শত যুগের ঘন আঁধার
গাঁয়ে আজো আছে।
সেই আঁধারে মানুষগুলো
লড়াই করে বাঁচে।

মনে আমার বলসে ওঠে
একান্তরের কথা,
পাখির ডানায় লিখেছিলাম-
প্রিয় স্বাধীনতা।

শব্দার্থ

কল-অলা	—	যন্ত্র-সংযুক্ত।
ঘন-আঁধার	—	ঘুটঘুটে অন্ধকার।
লড়াই	—	সংগ্রাম, যুদ্ধ।
বালসে ওঠে	—	উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পাঠ-পরিচিতি

গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও প্রিয় স্বাধীনতা একসূত্রে বাঁধা পড়েছে কবির হৃদয়ে।

শৈশবের মধুর স্মৃতিময় আপন গ্রামে কবি আবার ফিরে যেতে চান। সেখানকার পুকুরপাড়ে বিকেলে আলোছায়ার খেলা, রাতে বাঁশবাগানের ওপর চাঁদের হাসি, ঝোপঝাড় জোনাফির বিকিমিকি—এইসব সৌন্দর্য কবির মন জুড়ে রয়েছে। সেখানকার ধানের গন্ধ কবিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর শৈশবের দিনগুলোতে, যেখানে হাজার প্রজাপতির ইচ্ছেমতো ঘোরার আনন্দ।

কবি সেই সোনালি শৈশবকে হারিয়েছেন বহুদিন। কিন্তু প্রবীণ বয়সে কবি এক হলদে পাখির ডাকে আজ উম্মনা হয়েছেন শৈশব-স্মৃতিতে। তাঁর ইচ্ছে জাগে ছেলেবেলার মতো মেঘনা নদীর বাঁকে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু কেবল এই আনন্দই গ্রামের সবটুকু চিত্র নয়। এখনও গ্রামে আছে পশ্চাৎপদতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার। সেখানকার মানুষকে এখনও জীবনসংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। এই পশ্চাৎপদতার অন্ধকার অবস্থা ঘুটিয়ে মুক্তির ডানা মেলার জন্য ১৯৭১ এ অনেক রক্ত ঝরিয়ে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা।

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, গণ-আন্দোলন তাঁর কবিতায় নানা অনুভূতিতে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর কবিতা তাই দেশপ্রেম ও সামাজিক সচেতনতায় সতেজ ও দীপ্ত।

শামসুর রাহমান পেশায় সাংবাদিক। বিভিন্ন সময়ে তিনি ‘মর্নিং নিউজ’, ‘রেডিও বাংলাদেশ’, ‘দৈনিক গণশক্তি’, ইত্যাদিতে সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় এক দশক ধরে তিনি ছিলেন ‘দৈনিক বাংলা’র সম্পাদক। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তাঁর ৫০টির বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা অনুবাদেও তিনি সিন্ধুহস্ত। এছাড়া তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাও লিখেছেন।

শিশুদের জন্যও শামসুর রাহমান চমৎকার কবিতা লিখেছেন। ‘এলাটিং বেলাটিং’, ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো’, ‘গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে’, ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়া ও কবিতার বই।

সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে কবি শামসুর রাহমান বেশকিছু পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। এসব পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ‘বাংলা একাডেমী পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ও ‘মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক’।

শামসুর রাহমানের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর ঢাকায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে। তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘প্রিয় স্বাধীনতা’ কবিতায় কোন নদীর কথা উল্লেখ আছে ?
ক. পদ্মা খ. মেঘনা
গ. যমুনা ঘ. বুড়িগঙ্গা
২. মনে ‘আমার ঝলসে ওঠে’ এখানে ‘ঝলসে ওঠে’ বলতে বোঝানো হয়েছে—
ক. ভেসে ওঠা খ. স্মরণে আসা
গ. উজ্জ্বল হয়ে ওঠা ঘ. পুড়ে যাওয়া

নিচের স্তবকটি পড় এবং ৩-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শত যুগের ঘন আঁধার
গাঁয়ে আজো আছে
সেই আঁধারে মানুষগুলো
লড়াই করে বাঁচে।

৩. ‘শত যুগের ঘন আঁধার’-এ অংশে ‘শত যুগ’-এর অর্থ কী ?
ক. একশত বছর খ. একশত যুগ
গ. যুগযুগান্তর ঘ. প্রাচীন যুগ
৪. উপরের কবিতাংশে গ্রামে যে ‘আঁধার’-এর কথা বলা হয়েছে, তা কীভাবে দূর করা যায় ?
i. আর্থিক উন্নয়ন করে
ii. শিক্ষা বিস্তার করে
iii. বিদ্যুতায়িত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘প্রিয় স্বাধীনতা’ কবিতায় কবি তাঁর সোনালি শৈশবকে স্মরণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছে জাগে ছেলেবেলার মতো মেঘনা নদীর বাকে ঘুরে বেড়াতে। গ্রামের আনন্দই একমাত্র চিত্র নয়। গ্রামের আনন্দই অক্ষকার। কবির ভাষায়—

শত যুগের ঘন আঁধার
গাঁয়ে আজো আছে।

- | |
|---|
| ক. ‘প্রিয় স্বাধীনতা’ কবিতায় কোন কবি তাঁর শৈশবকে স্মরণ করেছেন ? |
| খ. উদ্ভূতাত্মক ‘সোনালি শৈশব’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে—ব্যাখ্যা কর |
| গ. ‘শত যুগের ঘন আঁধার/ গাঁয়ে আজো আছে।’ গাঁয়ের এই আঁধার দূর করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে? |
| ঘ. উদ্দীপকে কবির দেশপ্রেমবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। |

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাঁশবাগানে আখখানা চাঁদ
থাকবে ঝুলে একা।
ঝোপে ঝাড়ে বাতির মতো
জোনাক যাবে দেখা।

ধানের গন্ধে আনবে ডেকে
আমার ছেলেবেলা।
বসবে আবার দুচোখ জুড়ে
প্রজাপতির মেলা।

- ক. ‘প্রিয় স্বাধীনতা’ কবিতায় কবির গায়ের নাম কী ?
খ. ‘ধানের গন্ধে আনবে ডেকে/আমার ছেলেবেলা।’-এই পঙ্ক্তিদুটির ভাবার্থ লিখ।
গ. উদ্ভূতাত্মকের গ্রামবাংলার প্রকৃতির ছবির সঙ্গে তোমার পরিচিত একটি গ্রামের প্রকৃতির সম্পর্ক লিখ।
ঘ. ‘বসবে আবার দুচোখ জুড়ে/প্রজাপতির মেলা’-পঙ্ক্তি দুটির ভাবার্থ বিশ্লেষণ কর।

ঠিকানা

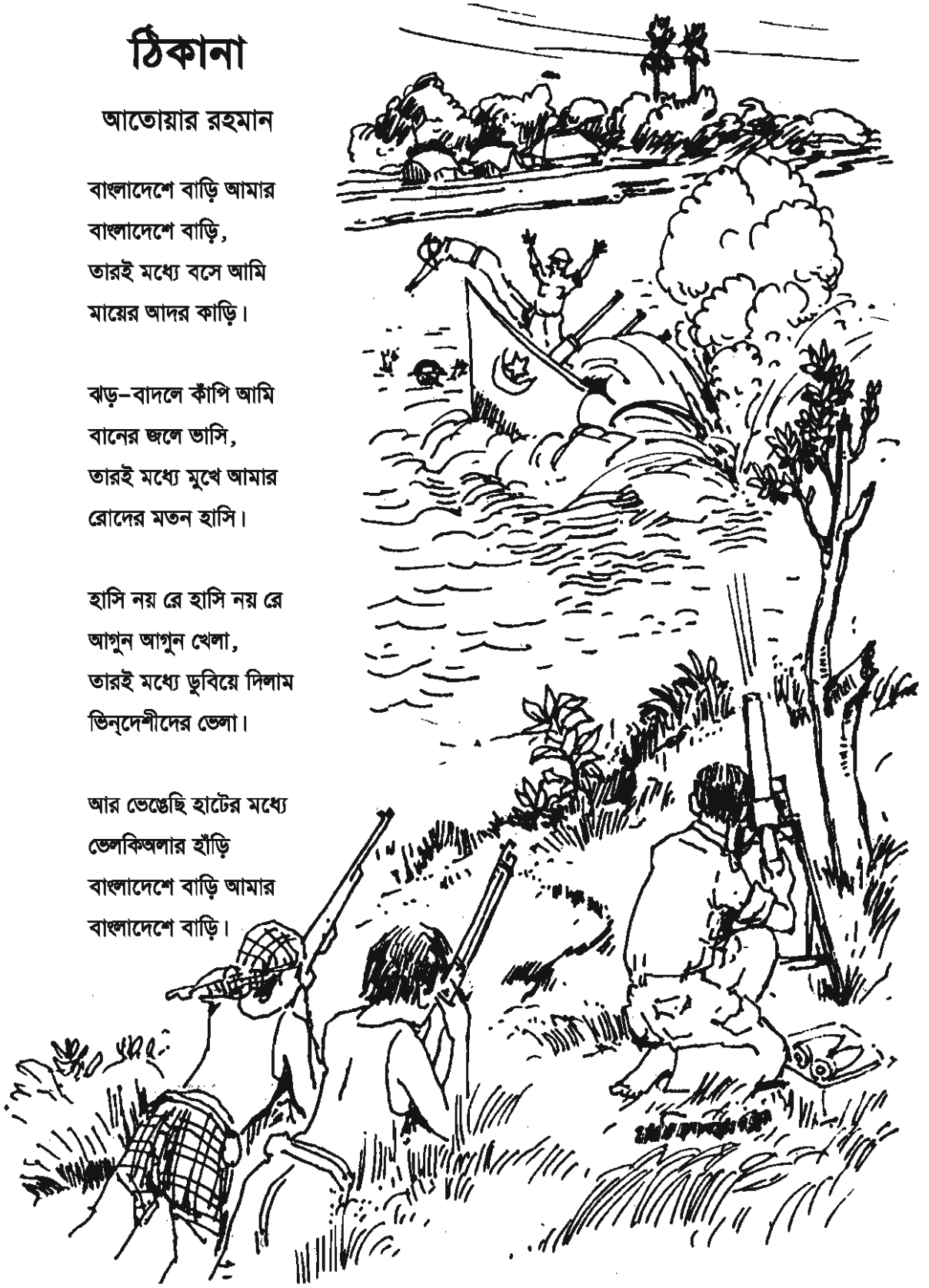
আতোয়ার রহমান

বাংলাদেশে বাড়ি আমার
বাংলাদেশে বাড়ি,
তারই মধ্যে বসে আমি
মায়ের আদর কাড়ি।

ঝড়-বাদলে কাঁপি আমি
বানের জলে ভাসি,
তারই মধ্যে মুখে আমার
রোদের মতন হাসি।

হাসি নয় রে হাসি নয় রে
আগুন আগুন খেলা,
তারই মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম
ভিন্দেদীদের ভেলা।

আর ভেঙেছি হাটের মধ্যে
ভেলকিঅলার হাঁড়ি
বাংলাদেশে বাড়ি আমার
বাংলাদেশে বাড়ি।



শব্দার্থ

বান	—	বন্যা
আগুন আগুন খেলা	—	আগুন নিয়ে লড়াই। এখানে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে।
ভিন্দেদেদেদের ভেলা	—	বিদেশীদের নৌযান। এখানে আক্রমণকারীদের জাহাজ বোঝানো হয়েছে।
ভেলকিঅলার হাঁড়ি	—	জাদুকরের জাদুর হাঁড়ি। এখানে শোষকদের অপকৌশলকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

‘ঠিকানা’ কবিতায় কবি স্বদেশভূমির প্রতি গভীর মমত্বের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমাদের ঠিকানা জন্মভূমি বাংলাদেশ। এদেশের মাটির বন্ধনে আমাদের চির-অধিকার। এ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় জনবসতি। কিন্তু সে সবার সঙ্গে সাহসে বুক বেঁধে লড়াই করি আমরা। জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার আনন্দ-সুখ পাই।

কিন্তু সেই আনন্দ একদা কেড়ে নেয় ভিন্দেদেদে দখলদাররা। স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য আমাদের সশস্ত্র লড়াই করতে হয়। শত্রুকে পরাজিত করে আমরা ছিনিয়ে আনি স্বাধীনতা। মিথ্যা মোহের জাল বিস্তার করে যারা চেপে বসেছিল আমাদের ওপর, তাদের আসল চেহারা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। মাতৃভূমির মাটিতে আমাদের জীবন এগিয়ে চলে।

কবি-পরিচিতি

আতোয়ার রহমানের জন্ম ১৯২৭ সালে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারার নওদা গ্রামে। বড় বিচিত্র তাঁর কর্মজীবন। রেলওয়ের সামান্য কর্মচারী থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন ‘দৈনিক সংবাদে’। কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে ১৯৮৪ সালে অবসর নেন।

স্কুলজীবন থেকেই তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বেশকিছু গল্প, স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। বিদেশি ভাষা থেকে অনূদিত কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁর রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি রচনা করেছেন শিশু সাহিত্য। সব মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ‘সাঁজের বেলার রূপকথা’, ‘মহাবিপ্লবের বীর সিপাহী’, ‘আজব প্রাণী আজব গাছ’, ‘কাচের পাহাড়’, ‘সোনার পাখি’, ‘গল্প যখন ভাষা নিয়ে’, ‘ছাপাখানার গল্প’, ‘সোনার হরিণ’, ‘মানুষ চলে সাগরতলে’, ‘তের নদীর পারে’, ইত্যাদি।

শিশুসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ‘বাংলা একাডেমী পুরস্কার’, ‘অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার’ ও ‘শিশু একাডেমী পুরস্কার’ পেয়েছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

‘ঠিকানা’ কবিতায় রচয়িতা হলেন—

- | | |
|----------------|----------------------|
| ক. নজরুল ইসলাম | খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| গ. জসীমউদ্দীন | ঘ. আতোয়ার রহমান |

২. ‘ঠিকানা’ কোন ধরনের কবিতা ?

- i. বিদ্রোহের
- ii. প্রকৃতির
- iii. স্বদেশপ্রেমের

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|---------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii. | ঘ. i ও ii |

৩. ভিনদেশীদের ভেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ক. ব্যবসায়ীদের জাহাজ | খ. বিদেশীদের জাহাজ |
| গ. বিদেশি আক্রমণকারীদের জাহাজ | ঘ. বিদেশি ভ্রমণকারীদের জাহাজ। |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ঝড়-বাদলে কাঁপি আমি
বানের জলে ভাসি,
তারই মধ্যে মুখে আমার
রোদের মতন হাসি।

- ক. কবিতার অংশটুকু কে রচনা করেছেন?
- খ. ‘ঝড়-বাদলে কাঁপি আমি/ বানের জলে ভাসি,’-পঙ্ক্তি দুটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্ভূত্যাংশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার বিবরণ দাও।
- ঘ. ‘তারই মধ্যে মুখে আমার/রোদের মতন হাসি।’-এই অংশে ‘রোদের মতন হাসি’ পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশ আমাদের ঠিকানা। কিন্তু একসময় এ ঠিকানা ভিনদেশী দখলদাররা কেড়ে নিয়ে আমাদেরকে পরাধীন করে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য আমাদের সশস্ত্র লড়াই করতে হয়। মিথ্যা মোহের জাল বিস্তার করা শত্রুকে পরাজিত করে আমরা ছিনিয়ে আনি স্বাধীনতা। আর ভেলকিঅলার হাঁড়ি ভাঙি হাটের মধ্যে।

- ক. পরাধীন কথাটার মানে কী ?
- খ. ‘ভেলকিঅলার হাঁড়ি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে -ব্যাখ্যা কর।
- গ. তোমার জানা বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধের যে-কোনো ঘটনা বর্ণনা কর।

৩. নিচের কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হাসি নয় রে হাসি নয় রে
আগুন আগুন খেলা,
তারই মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম
ভিন্দেদেদেদের ভেলা।

- ক. উদ্দীপকটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ?
খ. 'আগুন আগুন খেলা' পঙ্ক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে লিখ।
গ. যুদ্ধে বিরোধীদের জাহাজ কীভাবে ডোবানো যায়- লিখ।
ঘ. উদ্ভূতাত্মকের প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্লেষণ কর।

মৈত্রী

আবদুল কাদির

সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নূতন সমাজ
মানুষের সাথে কতু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ—
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।

দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত,
মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিকে প্রেমের প্রভাত,
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

হিংসা-দ্বেষ্ট রহিবে না কেহ কা'রে করিবে না ঘৃণা
পরস্পরে বাঁধি দিব প্রীতির বন্ধনে,
বিশ্ব জুড়ি এক সুরে বাজিবে গো মিলনের বীণা
মানব জাগিবে নব জীবন-স্পন্দনে।

স্বার্থ-সুখ চাহি না কো, আত্মনিষ্ঠ কেহ মোরা নয়;
পরার্থে করিব বিশ্বে সর্ব বিসর্জন
আমাদের আত্মত্যাগে প্রতিগৃহে নামিবে অভয়
মর্ত্যের মাটিতে হবে স্বর্গের সৃজন।

শব্দার্থ

সবারে	- সকলকে।	প্রীতি	- অনুরাগ, ভালোবাসা।
আত্মপর	- আপন ও পর।	স্পন্দন	- মৃদু কাঁপন।
বিচ্ছেদ	- ব্যবধান, অনৈক্য।	স্বার্থসুখ	- নিজের স্বার্থ হাসিল করার আনন্দ।
মৈত্রী	- মিত্রতা, বন্ধুত্ব।	সংঘাত	- সংঘর্ষ, লড়াই।
আত্মনিষ্ঠ	- কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।	পুণ্য	- সুকৃতি, ভালো কাজ।
পরার্থে	- পরের মজ্জল সাধনের জন্য।	সোল্লাসে	- উল্লাসের সঙ্গে।
সৃজন	- সৃষ্টি, নির্মাণ।	হিংসা	- ঘেঁষ, শত্রুতা, অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা।
অভয়	- সাহস, ভরসা।	সৌহার্দ্য	- বন্ধুত্ব, প্রীতি, সদ্ভাব।
সমুদিকে	- (সম + উদিকে), ভালোভাবে উদিত হবে, প্রকাশিত হবে।	আত্মত্যাগ	- অন্যের কল্যাণের জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতায় কবি-মনের একটি মহৎ ভাব প্রকাশিত হয়েছে। মানব-মৈত্রীর মহান আদর্শের আলোকে মানুষ হিসেবে আমাদের সুমহান করণীয় সম্পর্কে কবি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। প্রীতি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে এমন এক নতুন মানবসমাজ গড়তে চান যেখানে মানুষ মানুষে ভেদাভেদ, হানাহানি থাকবে না। স্বার্থপরতা ও হিংসাদ্বেষ ভুলে গিয়ে মানুষ বাঁধা পড়বে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে। একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগের পথে অগ্রসর হলে পৃথিবীতে গড়ে উঠবে স্বর্গসুখময় এক নতুন মানব সমাজ।

কবি-পরিচিতি

আবদুল কাদির এদেশে পরিচিতি লাভ করেছেন ‘ছান্দসিক কবি’ হিসেবে। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে তিনি এমন চমৎকার আলোচনা করেছিলেন যে তা রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল।

আবদুল কাদিরের জন্ম ১লা জুন ১৯০৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইসিধা গ্রামে। ১৯৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ‘মাহেনও’ পত্রিকার সম্পাদক ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশনা কর্মকর্তা।

‘দিলরুবা’ নামে তাঁর বিখ্যাত একটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ ও বেশকিছু প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ছন্দের ওপর তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। ‘নজরুল ও রোকেয়া রচনাবলি’ সহ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনায়ও তিনি মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নজরুল-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ‘বাংলা একাডেমী পুরস্কার’ ও ‘আদমজী সাহিত্য পুরস্কারে’ সম্মানিত হয়েছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সমুদিকে; শব্দটির অর্থ কী ?

ক. সমানভাবে প্রকাশিত

গ. ক্ষীণভাবে প্রকাশিত

খ. সমানভাবে উদিত হবে

ঘ. ভালোভাবে উদিত হবে

২. মানুষ জেগে উঠবে –

ক. নতুন জীবন নিয়ে

গ. মর্ত্যের মাটির মতো হয়ে

খ. সংঘাতমুক্ত হয়ে

ঘ. আত্মত্যাগী হয়ে

৩. পরের মজল সাধনের জন্য তুমি কী করবে ?

ক. সাধ্যমত আত্মত্যাগ করব

গ. স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করব

খ. সাধ্যের বাইরে কাজ করব

ঘ. ব্যবধান ভুলে যাব

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

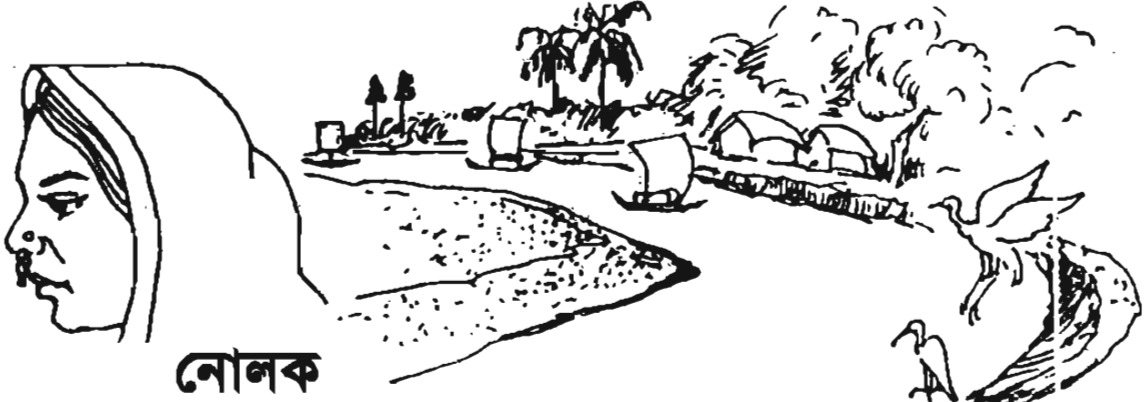
মানব-মৈত্রীর জন্য মানুষের আদর্শমূলক কাজ করা দরকার। হিংসা-দ্রোহ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। তাতে একই মানবিক সুরে মানবজীবন জেগে উঠবে।

ক. বিশ্বজুড়ে কিসের বীণ বেজে উঠবে ?

খ. 'মৈত্রী' কবিতায় কবিমনের কোন মহৎ ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে ?

গ. সত্যার্থ বন্ধুদের সঙ্গে তোমার মৈত্রীর ভাব কেমন – বর্ণনা কর।

ঘ. স্বর্গ সুখময় মানবসমাজ গড়ার যে মন্ত্র কবিতায় বলা হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।



নোলক

আল মাহমুদ

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
 হেথায় ঝুঁজি হোথায় ঝুঁজি সারা বাংলাদেশে।
 নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে ?
 —হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
 বলল কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে—
 শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।
 জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
 সবুজ বনের হরিণ টিয়ে করে রে ঝিকমিক
 বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
 আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাব তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
 আমরা তো সব পাখপাখালি বনের সাধারণ।
 সবুজ চুলে ফুল পিন্ধেছি নোলক পরি না তো।
 কুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো—
 বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহর-ভরা বুক
 হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
 এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়িলাম পা
 আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাব না।



চারুপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা

নোলক	— নাকে পরার অলঙ্কার।
আমার মায়ের সোনার নোলক	— মাতৃভূমির ঐতিহ্য ও সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত।
হরিৎ	— সবুজ।
ঘরকে যেতে চাই	— ঘরে ফিরতে চাই।
পিন্ধেছি	— পরিধান করেছি, অঞ্জো ধারণ করেছি।
সবুজ চুলে ফুল পিন্ধেছি	— বনের সবুজ বৃক্ষ যেন ফুলের অলঙ্কার পরেছে। সবুজ বন ফুলে ফুলে শোভিত।
আহার ভরা বুক	— খাদ্য সামগ্রীতে সমৃদ্ধ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন	— চারদিকে অন্ধকার করে রাত নেমে এল।
ঘরকে যাব না	— ঘরে ফিরবো না।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশের হারানো ঐতিহ্য ও হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের আকুলতা ‘নোলক’ কবিতার মূল ভাববস্তু। মাতৃভূমি বাংলাদেশ একদা ছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত, সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরপুর। ইতিহাসের নানা ক্রান্তিকালে এদেশের অনেক ঐতিহ্য ও সম্পদ গেছে হারিয়ে। কবি সেই হারানো ঐতিহ্য ও সম্পদের সন্ধান করেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কবির চোখে ভেসে ওঠে বাংলাদেশের অপূর্ব সৌন্দর্যসম্ভার। রূপালি নদীর গভীরে, বনের সবুজ শ্যামলিমায়, ফুলের সৌরভময় শোভায়, পাহাড়-বনানীর আদিগন্ত বিস্তারে ছড়িয়ে আছে অপার সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ও হৃত সম্পদকে পুনরুদ্ধার করতে হবে তাঁকে। তাহলেই ঐতিহ্য, সম্পদ ও সৌন্দর্যে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে অনন্য বিভাষ্য।

কবি-পরিচিতি

লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখে মাত্র আঠার বছর বয়সে সাংবাদিকতার পেশা নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আল মাহমুদ। দীর্ঘদিন তিনি ‘দৈনিক ইত্তেফাকে’ কাজ করেছেন। স্বাধীনতার পর ‘দৈনিক গণকণ্ঠে’র সম্পাদক হন। পরে শিল্পকলা একাডেমীতে যোগ দেন।

আল মাহমুদের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোড়াইলে ১১ই জুলাই ১৯৩৬ সালে। আল মাহমুদ একাধারে সাংবাদিক ও কবি। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। তাঁর অনেক কবিতায় গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা ও লোকজ চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতা লিখলেও গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। ছোটদের জন্য তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : ‘পাখির কাছে ফুলের কাছে’। আল মাহমুদ তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে বেশকিছু পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ‘বাংলা একাডেমী পুরস্কার’, ‘ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ‘মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক’ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমার মায়ের সোনার নোলক' বলতে বোঝায় -
 ক. সবুজ মাঠে সোনালি ফসল
 খ. মাতৃভূমির ঐতিহ্য ও সম্পদ
 গ. মায়ের নাকে সোনার গয়না
 ঘ. মুক্তিযুদ্ধ ও মায়ের অহংকার
২. 'আমার শরীর ভরা' - এখানে 'আমার' বলতে কাকে এবং 'ভরা' বলতে কিসে পরিপূর্ণ বলা হয়েছে?
 ক. বন, ফুলে ফুলে
 খ. পাহাড়, হাজার হরিণ
 গ. নদী, বোয়াল মাছ
 ঘ. মা, নোলক
৩. 'শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে'। -এর পরের লাইনটি কী?
 ক. বলল কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
 খ. জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
 গ. হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে
 ঘ. নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে ?
৪. কোন সারিতে একই অর্থবোধক দুটি ভিন্ন শব্দ রয়েছে?
 ক. এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন
 খ. সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে
 গ. হাত দিও না আমার শরীর
 ঘ. হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

'নোলক' কবিতায় কবি বাংলাদেশের হারানো ঐতিহ্য ও সম্পদের সম্মান করেন বিভিন্ন স্থানে। বাংলাদেশের অপূর্ব সৌন্দর্যসম্পন্ন কবির চোখে ভেসে ওঠে। কবি সে সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তবে যে, সকল ঐতিহ্য ও সম্পদ খোঁয়া গিয়েছে তা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

- ক. কবি যে-সকল স্থানে হারানো ঐতিহ্য খুঁজে বেড়ান তার একটির নাম লিখ।
- খ. বাংলাদেশের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- গ. দেশের ঐতিহ্য ও সম্পদ রক্ষার্থে কী করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর-যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
- ঘ. কবিতায় আমাদের হৃত ঐতিহ্য ও সম্পদের যে বিবরণ লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

জীবনের হিসাব

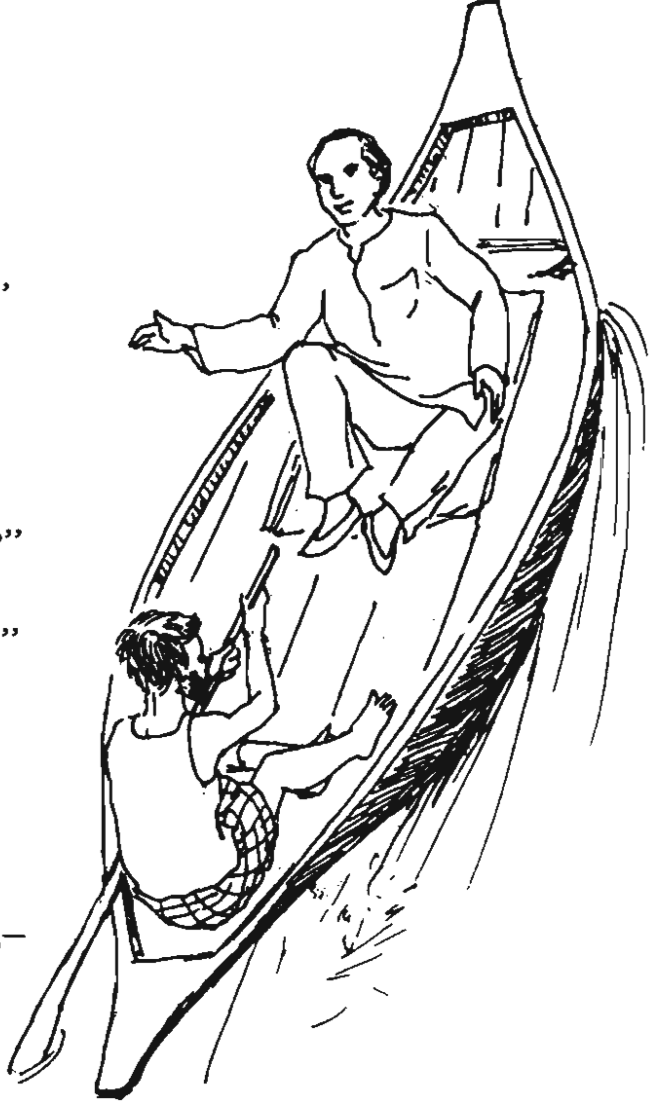
সুকুমার রায়

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে
মাঝিরে কন, “বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে ?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে ?”
বৃন্দ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, “সারা জনম মরুলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।”

খানিক বাদে কহেন বাবু, “বল তো দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় হতে নেবে ?
বল তো কেন লবণপোরা সাগর ভরা পানি ?”
মাঝি সে কয়, “আরে মশাই অত কি আর জানি ?”
বাবু বলেন, “এই বয়সে জানিসনেও তা কি ?
জীবনটা তোর নেহাত খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।”

আবার ভেবে কহেন বাবু, “বল তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো ?
বল তো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন ?”
বৃন্দ বলে, “আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?”
বাবু বলেন, “বলব কি আর, বলব তোরে কি তা,—
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।”

খানিক বাদে বাড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, “একি আপদ ওরে ও তাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকো এবার ? মরব নাকি আজি ?”
মাঝি শুধায়, “সাঁতার জানো ?” — মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, “মশাই, এখন কেন কাবু ?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।”



শব্দার্থ

ফ্যাল্‌ফেলিয়ে	—	হতবাক হয়ে।
চড়ি	—	আরোহণ করে।
বোট	—	নৌকা, তরী।
খেলো	—	মূল্যহীন, উৎকৃষ্ট নয় এমন, তুচ্ছ।
হেন	—	এরকম, এমন।
ধারা	—	প্রবাহ, রীতি।
আপদ	—	অপ্রীতিকর ব্যাপার, বিপদ, বিপত্তি, দুর্দশা।
লবণপোরা	—	লবণভর্তি, লবণাক্ত।
নেহাত	—	নিতান্ত, একবারে, পুরোপুরি।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতায় হাস্যরসের ভিতর দিয়ে কবি জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষার সাথে কেতাবি শিক্ষার পার্থক্য তুলে ধরেছেন এবং কেতাবি শিক্ষার সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অনেক বেশি জানেন—এ অহংকার নিয়ে নৌকার এক যাত্রী মাঝির কাছে জানতে চায় সূর্য ওঠার কারণ, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ও জোয়ারের কারণ ইত্যাদি। এর জবাব দিতে মাঝি অপারগ হওয়ায় বিদ্বান বাবুটি জানান, এ জ্ঞান না-থাকায় তার জীবন চার আনাই ব্যর্থ।

পরে যখন মাঝি পাহাড় থেকে নদীর নেমে আসার ও সাগরের পানি লোনা হওয়ার কারণ বলতে ব্যর্থ হয় তখন বিদ্বান বাবুটি তাচ্ছিল্যভরে জানান, মাঝির জীবন অর্ধেকই ব্যর্থ। এরপর বাবু আবারও মাঝির কাছে জানতে চান যে আকাশ নীল হওয়ার কারণ এবং সূর্য ও চাঁদে গ্রহণ লাগার কারণ সম্পর্কে অবগত কি না। বৃন্দ মাঝি লজ্জাভরে তার অপারগতার কথা বললে বিদ্বান বাবুটি সিদ্ধান্ত টানে, মাঝির জীবন বার আনাই বৃথা।

এমন সময় হঠাৎ ঝড় ওঠে। নৌকাডুবিতে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ওঠেন বিদ্বান বাবুটি। তখন মাঝি বাবুর কাছে জানতে চায়, তিনি সঁতার জানেন কি না? বাবু তখন জানান, তিনি সঁতার জানেন না। তখন মূর্খ মাঝি জানিয়ে দেয়, নৌকাডুবিতে বাবু যদি বাঁচতেই না পারেন তাহলে তাঁর ষোল আনা জীবনই মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

বস্তুত প্রায়োগিক জ্ঞান ছাড়া কেতাবি বিদ্যা সার্থক হয় না।

কবি-পরিচিতি

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর ‘আবোল-তাবোল’, ‘হ-য-ব-র-ল’ ও অন্যান্য অতুলনীয় লেখার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুকুমার রায় বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও শিশুসাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের পিতা।

সুকুমার রায়ের জন্ম কলকাতায় ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামে। সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয় ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর।

চারুপাঠ

সুকুমার রায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একদিকে বিজ্ঞান, ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণ-প্রকৌশলে উচ্চশিক্ষা নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ছড়া, রচনা ও ছবি আঁকায় মৌলিক প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ‘গোড়ায় গলদ’ নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক অদ্ভুত ক্লাব। নাম ‘ননসেন্স ক্লাব’। এই ক্লাবের পত্রিকার নাম ছিল ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’। আর তাঁর রচনাগুলো অদ্ভুত। ‘হাঁসজারু’, ‘বকচ্ছপ’, ‘সিংহরিণ’, ‘হাতিমি’ ইত্যাদি অদ্ভুত কাল্পনিক প্রাণীর নাম তাঁরই সৃষ্টি।

বিখ্যাত ‘সন্দেশ’ পত্রিকা বেশ কয়েকবার সম্পাদনা করেছেন সুকুমার রায়। আর এটিকে কেন্দ্র করেই ঐ সময় সুকুমার রায়ের সাহিত্যপ্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। সুকুমার রায় বাংলাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন প্রধানত হাস্যরসাত্মক কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। ছেলেবুড়ো সবাই তাঁর লেখা পড়ে আনন্দ পায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাবুমশাইর জীবনখানা ষোল আনাই মিছে, কারণ তিনি

ক. হঠাৎ নদীতে ডুবে গেছেন	খ. সাঁতার জানেন না
গ. চাঁদে গ্রহণ লাগার কারণ জানেন না	ঘ. অশিক্ষিত মানুষকে তুচ্ছ ভাবেন
২. বুড়ো ঝড়কে ভয় পায় না, কারণ সে-

ক. নদীতে সাঁতার কাটতে জানে	খ. ঝড় ওঠার কারণ বলতে পারে
গ. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চলতে জানে	ঘ. সঠিকভাবে নৌকা চালাতে জানে
৩. “একি আপদ ওরে ও ভাই মাঝি, ডুবল নাকি নৌকা এবার ? মরব নাকি আজি? –এই সংলাপে বাবুমশাইর কী প্রকাশ পেয়েছে?

ক. বীরত্ব	খ. ভয়
গ. আনন্দ	ঘ. বিস্ময়

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদ/ কবিতাংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নের জবাব দাও :

‘মূর্খ মাঝি বলে,’ মশাই, এখন কেন কাবু ?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।”

- ক. উদ্ভূতাত্মক কোন কবিতার অংশ?
- খ. বাবুমশাই -এর দৃষ্টিতে মাঝি কেমন লোক ?
- গ. জীবনপথে স্বাভাবিক চলার জন্য কী প্রয়োজন-তোমার পঠিত জীবনের হিসাব কবিতার আলোকে লিখ।
- ঘ. জীবন সম্পর্কে বাবু ও মাঝির উপলব্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

মানুষ জাতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে

সে জাতির নাম মানুষ জাতি;

এক পৃথিবীর সত্যে লালিত

একই রবি শশী মোদের সাথী।

শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা

সবাই আমরা সমান বুঝি,

কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি

বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।

দোসর ঝুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,

জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল

ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ

ভিতরের রং পলকে ফোটে,

বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র

কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।

বংশে বংশে নাকো তফাত

বনেদি কে আর গর-বনেদি,

দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ

দুনিয়া সবারি জনম-বেদি।

[সংক্ষিপ্ত পাঠ]



শব্দার্থ

একই পৃথিবীর

সত্যে লালিত

- একই মায়ের দুধ পান করে যেমন সন্তান-সন্ততির বড় হয়ে ওঠে, তেমনি পৃথিবীর সব জাতি-ধর্ম-গোত্রের মানুষ একই পৃথিবীর স্নেহছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে।

রবি শশী

- সূর্য ও চাঁদ।

শীতাতপ

- (শীত + আতপ) ঠান্ডা ও গরম।

ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা

- ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট।

কচি কাঁচাগুলি

ডাঁটো করে তুলি

- ছোটদের পরিপুষ্ট করে তুলি।

যুঝি

- যুদ্ধ করি, লড়াই করি, সংগ্রাম করি।

তরে

- জন্যে (সাধারণত কবিতায় এ শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

ডাঁটো

- পুষ্ট, শক্ত, সমর্থ।

বাঁচিবার তরে

সমান যুঝি

- প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য সব মানুষকেই লড়াই করতে হয়।

দোসর

- সাথী, বন্ধু, সঙ্গী।

ধলো

- সাদা।

জলে ডুবি, বাঁচি

পাইলে ডাঙা

- জীবনসংগ্রামে কখনও পরাজিত হই, কখনও সংকট পেরিয়ে নতুন আশায় বুক বাঁধি।

ডাঙা

- স্থল, উঁচুভূমি, চর।

জনম-বেদি

- সূতিকাগৃহ, জন্মস্থান।

ছোপ

- রঙের পোঁচ।

বাহিরের ছোপ

আঁচড়ে সে লোপ

- মানুষের বাহিরের চেহারার রং যাই হোক না কেন, আঁচড় লাগলে বা কেটে গেলে যে লাল রং বের হয় তা বাহিরের রঙের পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দেয়।

শূদ্র

- নিচুস্তরের হিন্দু সম্প্রদায়।

বনেদি

- প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত।

বুনিয়াদ

- ভিত্তি।

দুনিয়া সবারই

জনম-বেদি

- এ পৃথিবী সব মানুষেরই জন্মক্ষেত্র।

পাঠ-পরিচিতি

দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, ধর্মে ও বর্ণের পার্থক্য সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, কবি মানুষকে তার চেয়েও উপরে আসন দিয়েছেন।

আমাদের এই পৃথিবী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষেরই বাসভূমি। এই ধরণীর স্নেহছায়ায় এবং একই সূর্য ও চাঁদের আলোতে লালিত ও প্রতিপালিত হচ্ছে সব মানুষ। শীতলতা ও উষ্ণতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি সব মানুষেরই

সমান রয়েছে। প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং একে অন্যের উপর নির্ভর করে সব মানুষই বাঁচে। ঘর সংসার পেতে সুখ-দুঃখের মধ্যে সব মানুষই জীবন অতিবাহিত করে। পৃথিবীতে বাইরের চেহারা মানুষের মধ্যে সাদা কালোর ব্যবধান থাকলেও সব মানুষের ভেতরের রং এক ও অভিন্ন। সবারই শরীরে প্রবাহিত একই লাল রক্ত।

মানুষ আজ জাতিভেদ, গোত্রভেদ, বর্ণভেদ, ও বংশকৌলীন্য ইত্যাদি কৃত্রিম পরিচয়ে নিজেদের পরিচয়কে করেছে সংকীর্ণ ও গড়িবদ্ধ। কিন্তু গোটা দুনিয়ার সঙ্গে মানুষের যে জন্মসম্পর্ক, সেই বিচারে মানুষের আসল পরিচয় হচ্ছে—সে মানুষ। সারা পৃথিবীতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র পরিচয়ের উর্ধ্বে যে সমগ্র মানবসমাজ, কবি এই কবিতায় মানুষের সেই পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন। মানুষের বড় পরিচয়—সে মানুষ। পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষ জাতি।

কবি-পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু ঘটে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দের কবিতা লিখে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘ছন্দের জাদুকর’ হিসেবে খ্যাতিমান হন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ব্যবসায় অর্থ নিয়োগ করে। কিন্তু পরে ব্যবসা ছেড়ে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ অনেকগুলো ভাষা জানতেন। তিনি কোরআনের বাণীকে বাংলা কবিতায় রূপ দিয়েছেন এবং অনেকগুলো বিদেশি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ রচনা ও অনুবাদ করলেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মূলত কবি হিসেবেই সুপরিচিত। তাঁর প্রায় ষোলটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর লেখা কবিতাগুলো ‘শিশু কবিতা’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কোন পরিচয়ে পৃথিবীর সব মানুষ এক?
 - ক. বংশ-পরিচয়ে
 - খ. ধর্মীয় পরিচয়ে
 - গ. জাতিসত্তার পরিচয়
 - ঘ. মানুষ পরিচয়ে
- পৃথিবীর সকল মানুষের বড় পরিচয় সে মানুষ -এর স্বপক্ষে বড় যুক্তি হল—
 - ক. সকল মানুষ একই ভাবে বেড়ে ওঠে
 - খ. সবার ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা এক
 - গ. সবাই একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
 - ঘ. সকলের রক্তের রঙই লাল
- কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।
এখানে মানুষের যে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হল—
 - i. জন্মপরিচয়
 - ii. বংশপরিচয়
 - iii. শারীরিক বৈশিষ্ট্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাবা : জিয়া, তুমি কি নেলসন ম্যান্ডেলার নাম শুনছ?

জিয়া : না বাবা।

বাবা: নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদী নেতা। যার কল্যাণে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষেরা দাসত্ব/বর্ণবাদ থেকে মুক্ত হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

জিয়া : বাবা, কবি যেমন বলেছেন—কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা।

বাবা : ঠিক তাই।

ক. ‘সমান রাঙা’- বলতে কবি কিসের কথা বলেছেন ?

খ. উদ্ভূতাত্ত্বিকের মূল ভাব ব্যাখ্যা কর।

গ. জাতি ও বর্ণভেদ দূরীকরণের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ?

ঘ. ‘মানুষ জাতি’ কবিতার আলোকে নেলসন ম্যান্ডেলার কার্যক্রম মূল্যায়ন কর।

২. নিচের কবিতাংশটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত

একই রবি শশী মোদের সাথী।

শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা

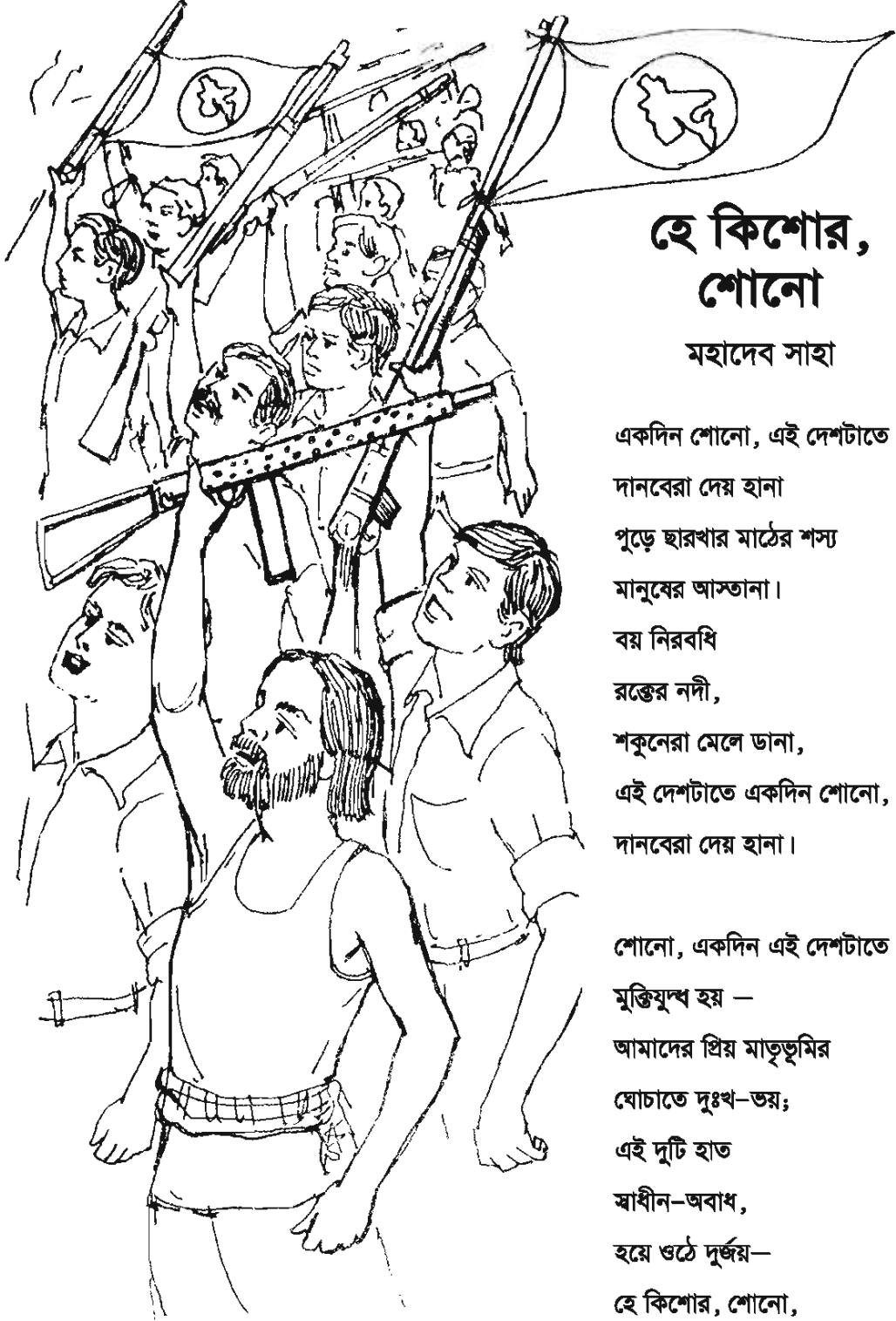
সবাই আমরা সমান বুঝি,

ক. উল্লিখিত কবিতাংশটি কার লেখা ?

খ. এখানে এক পৃথিবীর স্তন্যে ললিত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. পৃথিবীর সকল মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সমান – তুমি কি তা মনে কর ? তোমার পঠিত ‘মানুষজাতি’ কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা সবাই আমরা সমান বুঝি –বিশ্লেষণ কর।



হে কিশোর, শোনো

মহাদেব সাহা

একদিন শোনো, এই দেশটাতে
দানবেরা দেয় হানা
পুড়ে ছারখার মাঠের শস্য
মানুষের আস্তানা।
বয় নিরবধি
রক্তের নদী,
শকুনেরা মেলে ডানা,
এই দেশটাতে একদিন শোনো,
দানবেরা দেয় হানা।

শোনো, একদিন এই দেশটাতে
মুক্তিযুদ্ধ হয় —
আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির
ঘোচাতে দুঃখ-ভয়;
এই দুটি হাত
স্বাধীন-অবাধ,
হয়ে ওঠে দুর্জয়—
হে কিশোর, শোনো,
আমরা সেদিন যুদ্ধ করেছি জয়।

শব্দার্থ

দানব	—	দৈত্য, অসুর, (স্ত্রী লিঙ্গো দানবী)।
ছারখার	—	ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়েছে এমন, ধ্বংসীভূত।
আস্তানা	—	আখড়া, বাসস্থান।
নিরবধি	—	অনন্ত, অন্তহীন, অবধি বা শেষ নেই এমন।
হানা	—	আক্রমণ।
অবাধ	—	বাধাবন্ধনহীন, যাতে কোনো বাধা নেই।
দুর্জয়	—	যা প্রতিরোধ করা যায় না।

পাঠ-পরিচিতি

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের অসামান্য গৌরবগাথা। বাংলাদেশের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ঘটনাই তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এই রচনায়।

১৯৭১-এর মার্চে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এদেশের ওপর। তারা আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেয় মাঠের ফসল, ধ্বংস করে ঘরবাড়ি। হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে বইয়ে দেয় রক্তের স্রোত। হিংস্র শকুনের মতো তৎপর হয়েছিল এদেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করতে।

পাকিস্তানি হানাদারদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে সেদিন শুরু হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধ। শত্রুর অস্ত্রের মোকাবেলায় দুর্বীর সশস্ত্র সঞ্চারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। দুর্জয় মনোবল নিয়ে তারা লড়াই চালিয়েছে, দুঃখ ও আতঙ্কে ভরা দিনগুলোর হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বীর সাহস ও অসীম বীরত্বে লড়াই করে ছিনিয়ে এনেছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়।

কবি-পরিচিতি

কবি মহাদেব সাহা পেশায় সাংবাদিক। সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন ‘দৈনিক ইত্তেফাক’-এ। বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সমাজ-সচেতন ও সৌন্দর্য-পিপাসু এই কবির বেশকিছু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘মানব এসেছি কাছে’, ‘কী সুন্দর অন্ধ’, ‘ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস’, ‘বৈঁচে আছি স্বপ্ন মানুষ’ ইত্যাদি।

মহাদেব সাহা প্রাবন্ধিক হিসেবেও পরিচিত। ছোটদের লেখা তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : ‘টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর’, ‘ছবি আঁকা পাখির কথা’, ইত্যাদি।

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ‘বাংলা একাডেমী পুরস্কার’-সহ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। মহাদেব সাহা ১৯৪৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানঘরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল
ক. ১৯৭১-এর মার্চে
খ. ১৯৭১-এর এপ্রিলে
গ. ১৯৭১-এর মে-তে
ঘ. ১৯৭১-এর জুনে
২. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল দেশের
i. সাধারণ জনগণ
ii. সেনাবাহিনী
iii. মুক্তিবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক

- | | |
|--------|---------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii, iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একদিন শোনো, এই দেশটাতে
দানবেরা দেয় হানা
পুড়ে ছারখার মাঠের শস্য
মানুষের আস্তানা।
ক. উল্লিখিত অনুচ্ছেদে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে ?
খ. সে সময়ের দেশের অবস্থা বর্ণনা কর।
গ. মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে তুমি কী শিক্ষা লাভ কর?
ঘ. মাতৃভূমির রক্ষার্থে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
২. শোনো, একদিন এই দেশটাতে মুক্তিযুদ্ধ হয়—
ক. উল্লিখিত লাইন কোন কবিতার অংশ ?
খ. মুক্তিযুদ্ধ কেন হয়েছিল বর্ণনা কর।
গ. তোমার জানা মুক্তিযুদ্ধের একটি ঘটনা বর্ণনা কর।
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।